কৈলাসে কেলেঙ্কারি (১৯৭৩)

০১. জুন মাসের মাঝামাঝি

জুন মাসের মাঝামাঝি। স্কুল ফাইনাল দিয়ে বসে আছি, রেজাল্ট কবে বেরোবে জানি না। আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক দুটো বাজতে দশ মিনিটে এমন তেড়ে বৃষ্টি নামল যে সে আশা ত্যাগ করে একটা নতুন কেনা টিনটিনের বই নিয়ে বৈঠকখানায় তক্তাপোশে বসে বেশ মশগুল হয়ে পড়ছি! টুনটুনির বই না, টিনটিনের বই। টিনটিন ইন টিবেট। বেলজিয়াম থেকে ফরাসি ভাষায় বেরোয় এই আশ্চর্য কমিক বই। তারপর পৃথিবীর নানান ভাষায় অনুবাদ হয়। এখানে আসে ইংরেজিটা। আমার আর ফেলুদার দুজনেরই মতে রহস্য রোমাঞ্চ সাসপেন্স আর হাসিতে ভরা এর চেয়ে ভাল কমিক বই আর নেই। এর আগে আরও তিনটে কিনেছি, এটা নতুন, প্রথমে আমি পড়ব, তারপর ফেলুদা। ও এখন সোফায় কগত হয়ে শুয়ে দ্য চ্যারিয়ট অফ দ্য গড়স বলে একটা বই পড়ছে। পড়ছে মানে, একটু আগেও পড়ছিল, এখন শেষ করে সেটা বুকের ওপর রেখে সিলিঙে ঘুরন্ত পাখাটার দিকে চেয়ে আছে। মিনিটখানেক। এইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, গিজার পিরামিডে কাটা পাথরের ব্লক আছে জানিস? দুই লক্ষ।

বেশ। জানলাম। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন পিরামিড নিয়ে পড়েছে বুঝলাম না। ফেলুদা বলে চলল, এই ব্লকের এক একটার ওজন প্রায় পনেরো টন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যা আন্দাজ করা যায় তার সাহায্যে দিনে দশটার বেশি ব্লক নিখুঁতভাবে পালিশ করে ঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে বসানো মিশরীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া যেখানে পিরামিড, তার ত্রিসীমানায় ওই পাথর নেই। সে পাথর আসত নীকো করে, নাইল নদীর ওপর থেকে। সাধারণ বুদ্ধিতেও হিসেব করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় জানিস? ওই একটি পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল কমপক্ষে ছশো বছর।

ভাববার কথা বটে। বললাম, এটা কি ওই বইয়ে লিখেছে?

শুধু এটা নয়। প্রাচীন কালের আরও অনেক আশ্চর্য কীর্তির কথা এতে আছে যেগুলো কী করে সম্ভব হয়েছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন না, বা বলার চেষ্টাও করেন না। আমাদের দেশেই দেখ না। দিল্লিতে কুতুবমিনারের পাশে যে লৌহস্তম্ভ আছে তাতে দু হাজার বছরেও মরচে ধরেনি কেন? ইস্টার আইল্যান্ডের নাম শুনেছিস? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেই দ্বীপে গেলে দেখা যায়, কোন আদ্যিকালে কারা জানি পেল্লায় সব মানুষের মাথা পাথরে খোদাই করে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পাথর আছে দ্বীপের মাঝামাঝি; মাথাগুলো এনে রাখা হয়েছে সেখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে। একেকটার ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন। জংলি লোকে কী করে এ জিনিসটা করল? লরি, ক্রেন, ট্রাকটর, বুলডোজার-এ সব তো তখন ছিল না।

ফেলুদা এর মধ্যে একটা চারমিনার ধরিয়েছে। বইটা পড়ে ও যে বেশ উত্তেজিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, পেরুতে একটা জায়গায় মাইলের পর মাইল জুড়ে মাটির উপর জ্যামিতিক রেখা আর নকশা কাটা আছে। আদ্যিকাল থেকে সেটার কথা লোকে জানে; প্লেন থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ কবে কেমন কীভাবে সেগুলো কাটা হল তা কেউ জানে না। রহস্য এতই গভীর যে সেটা নিয়ে কেউ ভাবতেও চায় না।

যিনি ওই বইটা লিখেছেন তিনি ভেবেছেন বুঝি?

প্রচুর ভেবেছেন; আর ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আজ থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহ থেকে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত কোনও প্রাণী পৃথিবীতে এসে মানুষকে তাদের জ্ঞানের খানিকটা অংশ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পিরামিড ইত্যাদি হচ্ছে এই অতিমানবীয় টেকনলজির নিদর্শন, যাকে আজকের মানুষও টেক্কা দিতে পারেনি। কুরুক্ষেত্রে যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আজকের অ্যাটমিক মরণাস্ত্রের মিল তা জানিস তো?

তার মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও কি অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে—

ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই বাধা পড়ল। এই বৃষ্টির মধ্যেই কে জানি এসে আমাদের কলিং ষোলটায় পর পর তিনবার সজোরে চাপ দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হুমড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন সিধুজ্যাঠা, আর তাঁর হাতের ছাতাটা ব্যাপাত করে বন্ধ করতেই আরও খানিকটা জল চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল।

কী দুর্যোগ কী দুর্যোগ একটু চা বলো তোমার ওই ভাল চা, এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন সিধুজ্যাঠা। আমি এক দৌড়ে গিয়ে শ্রীনাথকে ঘুম ভাঙিয়ে তিন কাপ চা করতে বলে ফিরে এসে দেখি সিধুজ্যাঠা সোফায় বসে সাংঘাতিক ভ্রূকুটি করে টেবিলের উপরে রাখা চিনে মাটির অ্যাশট্রেটার দিকে চেয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, আপনি এই বাদলায় রিকশা না নিয়ে—

মানুষ খুন তো আকছার হচ্ছে; তার চেয়েও সাংঘাতিক খুন কী জান?

ফেলুদা থতামত, চুপ! আমি তো বটেই। যিনি প্রশ্নটা করেছেন তিনিই উত্তর দেবেন।

সেটাও জানি। সিধুজ্যাঠা বললেন, এ কথা সবাই মানে যে, আজকে আমাদের দেশটা উচ্ছন্নে যেতে বসলেও, এককালে অনেক কিছুই এখানে ঘটেছিল যা নিয়ে আজও আমরা গর্ব্ব করতে পারি। এর

মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার বিষয়টা কী জানো তো? সেটা হল। আমাদের শিল্পকলা, যার অনেক নমুনা আমরা আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। কেমন, ঠিক কি না?

ঠিক। ফেলুদা চোখ বুজে মাথা নেড়ে সায় দিল।

এই অ্যাটের মধ্যেও যেটা সেরা, সেটা হল ভারতবর্ষের মন্দির, আর তার গায়ের কারুকার্য। ঠিক কি না?

ঠিক।

সিধুজ্যাঠা জানেন না। এমন বিষয় নেই। তবে তার মধ্যেও আর্টের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাঁর তিন আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারিই হল আর্টের বই। কিন্তু খুনের কথা কী বলছিলেন সেটা এখনও বোঝা গেল না।

একটা মাদ্রাজি চুরুট ধরাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে দুবার কেশে একটু দম নিয়ে সিধুজ্যাঠা বললেন, এককালে কালাপাহাড় ধর্ম চেঞ্জ করে হিন্দু মন্দিরের কী সর্ব্বনাশ করে গেছে সে তো জান। কিন্তু আজ এই উনিশশো তিয়াত্তরে আবার যে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে সেটা জান কি?

আপনি কি মন্দিরের গা থেকে মূর্তি খুলে নিয়ে ব্যবসা করার কথা বলছেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এগজাক্টলি! সিধুজ্যাঠা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন। এটা যে কতবড় একটা ক্রাইম সেটা ভাবতে পার? দোহাইটা এখানে ধর্মেরও নয়, স্রেফ ব্যবসার। ধনী আমেরিকান টুরিস্টরা এইসব মূর্তি হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিনে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ ব্যাপারটা এমন গোপনে হচ্ছে যে ধরার কোনও উপায় নেই। তবে এইসব শিল্প হত্যাকারীদের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। আজ দেখলুম ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের একটা যক্ষীর মাথা গ্র্যান্ড হোটেলে এক আমেরিকান টুরিস্টের কাছে।

বলেন কী ফেলুদা রীতিমতো অবাক। রাজারাণী যে ভুবনেশ্বরের একটা বিখ্যাত মন্দির সেটা আমিও জানতাম। ছেলেবেল পুরী-ভুবনেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, বাবা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লাল পাথরের মন্দির, তার গায়ে অদ্ভুত সব মূর্তি আর নকশা।

সিধুজ্যাঠা বলে চললেন, আমার কাছে কিছু পুরনো রাজপুত পেন্টিং ছিল, থার্টি-ফোরে কিনেছিলুম কাশীতে, সেইগুলো নিয়ে গিয়েছিলুম নগরমলকে দেখাতে। নগরীমলের দোকান আছে জান তো গ্র্যান্ড

হাটেলের ভেতরে?–আমার অনেক দিনের চেনা। ছবিগুলো খুলে রেখেছি কাউন্টারের উপর, এমন সময় এই মার্কিন বাবুট এলেন। মনে হল নগরীমলের কাছ থেকে আগে কিছু জিনিসটিনিস কিনেছে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। বেশ ভারী জিনিস বলে মনে হল। মোড়কটি যখন খুললে না-বলব কী ফেলু-আমার হৃৎপিণ্ডটা একটা লাফ মেরে গলার কাছে চলে এল। একটা মূর্তির মাথা। লাল পাথরের তৈরি। আমার চেনা মুখ, শুধু তফাত এই যে সে মুখকে ধড়ের সঙ্গে লাগা অবস্থায় দেখেছি, আর এখন দেখছি সেটাকে ছেনি দিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। আমার তো মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। নগরমল দেখে বললে জিনিসটা খাঁটি, ছাঁচ বা নকল নয়। সে মার্কিন ছাকরা বললে দু হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে কোন প্রাইভেট ডিলারের কাছ থেকে। আমি মনে মনে বললুম—যা ভাবছি তাই যদি হয় তা হলে আরও দুটো শূন্য বাড়িয়ে দিলেও ন্যায্য দাম দেওয়া হত না। যাই হাক, সে ব্যাটা তো হোটেলে চলে গেল, আমি নিজেও ষোলো আনা শিওর হতে পারছিলুম না, তাই সোজা বাড়ি এসে জিমারের বই খুলে দেখি কী-যা ভেবেছিলুম তাই! ও মুণ্ডু খসে রাজারাণীর গা থেকে ভেঙে আনা হয়েছে। অথচ এ সব মন্দিরে সরকারি পাহারা থাকে। ঘুষ খেয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল তো ওইটেই চাবিকাঠি কিনা। আমি অবিশ্যি এর মধ্যেই ভুবনেশ্বরের আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্রেস চিঠি লিখে দিয়েছি। কিন্তু তাতেই বা কী হবে। ওই পার্টিকুলার মাথাটাকে তো আর বাঁচানো গেল না; আর মন্দির যা জখম হবার তাও হয়ে গেল।

আমারও মনে হচ্ছিল যে এইভাবে আমাদের মন্দিরের মূর্তি ভেঙে বিদেশের লোককে বিক্রি করাটা সত্যিই একটা ক্রাইম।

শ্রীনাথ চা এনে দিয়েছে, সিধুজ্যাঠা কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে গভীর গলায় বলল, ভাবছি কীভাবে এর প্রতিকার হয়। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর কী করতে পারি বলো। তাই বুঝলে ফেলু, তোমার কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, অপরাধী খুঁজে বেড়াও তুমি, এর চেয়ে বড় আর কী অপরাধ থাকতে পারে? এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি করলে হয়তো পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাতেই বা কী ভরসা? এ তো আর সোনা রুপো বা হিরেজহরত নয়, যার দামটা বাজারদার থেকে হিসেব করে নেওয়া যায়। আর্টের ভ্যালুটা অন্য রকম; সেটা সবাই বোঝে না। আমি এমনও শিক্ষিত লোক জানি যারা জোড়বাংলা মন্দির দেখে বলে ওর মধ্যে আর কী আছে, আর কাংড়া ছবি দেখে বলে এর চেয়ে হেমেন মজুমদার ভাল।

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল। এবার বলল, সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের নামটা জেনেছিলেন কি?

জেনেছি বইকী। এই যে তার কার্ড।

সিধুজ্যাঠা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে ফেলুদাকে দিল। উঠে গিয়ে দেখলাম তাতে নাম ছাপা রয়েছে–সল সিলভারস্টাইন–আর তার নীচে

ইহুদি, সিধুজ্যাঠা বললেন।—স্টাইন দেখলেই বুঝবে ইহুদি। লোকটা ডাকসাইটে ধনী। তাতে সন্দেহ নেই। হাতে একটা ঘড়ি পরেছিল। তেমন ঘড়ি বাপের জন্মে দেখিনি। তারই দাম বোধহয় হাজারখানেক ডলার।

ভদ্রলোক ক'দিন থাকবেন কিছু বলেছিলেন?

কাল সকালেই কাঠমাণ্ডু চলে যাচ্ছে। অবিশ্যি এখন হয়তো তাকে ফোন করলে পেতে পার।

ফেলুদা উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। কলকাতার বেশির ভাগ জরুরি টেলিফোনের নম্বর ওর মুখস্ত। তার মধ্যে অবিশ্যি হাটেলও বাদ পড়ে না।

ফোন করে জানা গেল মিস্টার সিলভারস্টাইন তাঁর ঘরে নেই, কখন ফিরবেন কোনও ঠিক নেই। ফেলুদা যেন একটু হতাশ হয়েই ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, যে লোকটা মূর্তিটা বিক্রি করেছিল তার অন্তত চেহারার বর্ণনাটা পেলেও একটা রাস্তা পাওয়া যেত।

সেটা তো আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত ছি, সিধুজ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। —কিন্তু কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। ভদ্রলোক আবার আমার ছবিগুলো দেখছিলেন। দেখে বললেন, তার তান্ত্রিক আর্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট, আমি সন্ধান পেলে যেন তাকে জানাই। এই বলে তার একখানা কার্ড বের করে আমার হাতে দিলে। ...সত্যি, তুমি যে কীভাবে প্রোসিড করবে তা তো আমার মাথায় আসছে না।

দেখি, ভুবনেশ্বর থেকে কোনও খবর আসে কি না। রাজারাণীর গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে গেলে তো হইচই পড়ে যাওয়া উচিত।

সিধুজ্যাঠা এক চুমুকে চা-টা শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, বছরখানিক থেকে এ বাঁদরামির কথাটা কানে আসছিল, তবে অ্যাদ্দিন এদের নজরটা ছিল ছোটখাটা অখ্যাত মন্দিরের উপর। এখন মনে হচ্ছে এদের সাহসটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। আমার ধারণা অত্যন্ত বেপরোয়া ও শক্তিশালী কিছু লোক রয়েছে

এই কেলেঙ্কারির পেছনে। ফেলু। যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে পার তো দেশ তোমাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।

সিধুজ্যাঠা চলে যাবার পর ফেলুদা গ্র্যান্ড হোটেলে রাত এগারোটা পর্যন্ত বার বার ফোন করেও সেই আমেরিকানকে ধরতে পারল না। শেষবারের বার ফোনটা রেখে দিয়ে গভীর গলায় বলল, সিধুজ্যাঠা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়—সত্যিই যদি ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা আমেরিকানদের হাতে চলে গিয়ে থাকে-তা হলে ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায়; আর যে লোক এই পাচারের কাজটা করেছে। সে নিঃসন্দেহে একটা পয়লা নম্বরের ক্রিমিনাল। খারাপ লাগে ভাবতে যে আমার পক্ষে এগোনোর কোনও রাস্তা নেই; কোনওই রাস্তা নেই।

রাস্তা একটা বেরিয়ে গেল। পরদিনই। আর সেটা বেরোল এমন একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে ভাবলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে।

০২. দুর্ঘটনার কথা

দুর্ঘটনার কথা বলার আগে আরেকটা জরুরি কথা বলা দরকার। সিধুজ্যাঠার আন্দাজ যে ঠিক সেটা পরদিনের আনন্দবাজারেই জানা গেল। আমিই প্রথম পড়লাম খবরটা–

মস্তকহীন যক্ষী

ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বরের রাজারানী মন্দিরের গাত্র থেকে একটি যক্ষীমূর্তির মস্তকাংশ অপহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের প্রহরীটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ওড়িশার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এ ব্যাপারে পুলিশ তদন্তের আয়োজন করেছে। বলে জানা গেল।

খবরটা পড়ে ফেলুদাকে বললাম, তার মানে পাহারাদারই মাথাটা চুরি করেছে?

ফেলুদা তার ফরহ্যানসের টিউবটা টিপে আধা ইঞ্চি পেস্ট বার করে ব্রাশের উপর চাপিয়ে বলল, এ চুরি কি আর পাহারাদরে করে? গরিব লোকের অতি সাহস হয় না। চুরি করেছে ভদ্রলোকে। সে মোটা ঘুষ দিয়েছে প্রহরীকে, প্রহরী তাই আপাতত গা ঢাকা দিয়েছে।

সিধুজ্যাঠা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছে। আমার মন বলছিল যে তাঁর আন্দাজ ঠিক হয়েছে জেনে তিনি নিশ্চয়ই সদর্পে সেটা ঘোষণা করতে আসবেন। শেষ পর্যন্ত এলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা চার ঘণ্টা পরে, সাড়ে দশটার সময়। আজ বিষুদৃদবার, নটা থেকে আমাদের বাড়ির বিজলি বন্ধ হয়ে গেছে, এদিকে আকাশে মেঘ করে গুমোট হয়ে রয়েছে, বৈঠকখানায় বসে ঘামছি, এমন সময় দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। দরজা খুলতেই আবার সেই হুমড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকা, চায়ের হুকুম, আর পরীক্ষণেই ধাপ করে সোফায় বসা! ফেলুদা ভুবনেশ্বরের কথাটা উচ্চারণ করতেই তিনি এক দাবড়ানিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ও সব ছাড়ে। ওগুলো ফালতু কথা। রেডিয়া শুনেছ?

কইনা তো। আসলে আজ—

জানি। বিষুদবার। অথচ তাও একটা ট্রানজিস্টার কিনবে না। যাকগে.সাংঘাতিক খবর। কাঠমাণ্ডুর প্লেন ক্র্যাশ করেছে। কলকাতার কাছেই। এক ঘণ্টা ডিলে ছিল। সাড়ে সাতটায় মাটি ছেড়েছে, ফিফুটিন মিনিটসের মধ্যে ক্র্যাশ করেছে। ঝড়ে পড়েছিল। বোধহয় ফিরে আসবার চেষ্টা করছিল। কার সারারাত

কীরকম ঝোড়ো বাতাস ছিল সে তো জানাই। আটান্নজন যাত্রী, অল ডেড। মার্কিন ব্যাঙ্কার সাল সিলভারপ্রস্টাইন তার মধ্যে ছিলেন সে কথা রেডিয়োতে বলেছে।

খবরটা শুনে আমরা দুজনেই একেবারে থা। ফেলুদা বলল—কোথায় ক্র্যাশ করেছে? জায়গার নাম বলেছে?

সিদিকপুর বলে একটা গ্রামের পাশে। হাসনাবাদের দিকে। ফেলু, মনে মনে প্রার্থনা করছিলুম। সে মূর্তি যেন দেশ ছেড়ে না যায়। সে প্রার্থনা যে এমনভাবে মঞ্জুর হবে তা কি আর জানতাম?

ফেলুদা হাতের রিস্টওয়াচের দিকে দেখল। সে কি সিদিকপুর যাওয়ার মতলব করছে না। কি?

সিধুজ্যাঠারাও কেমন যেন তটস্থভাব। বললেন, আমি যা ভাবছি, তুমিও নিশ্চয় সেই কথাই ভাবছ। প্লেন মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সপ্লেশন হয়। যাত্রীর সঙ্গে তার ভেতরের জিনিসপত্রও চারদিকে ছিটকে পড়ে; যেমন সব ক্র্যাশেই হয়। সেই জিনিসপত্রের মধ্যে যদি...

ফেলুদা দু মিনিটের মধ্যে ঠিক করে ফেলল যে প্লেন যেখানে ক্র্যাশ করেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে। যক্ষীর মাথাটা পাওয়া যায় কি না। তিন ঘণ্টা হল ক্র্যাশটা হয়েছে, যেতে লাগবে ঘণ্টা দেড়েক। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এয়ারলাইনের লোক, দমকল, পুলিশ ইত্যাদি সেখানে গিয়ে তাদের কাজকর্ম খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দ্বিয়েছে। আমরা গিয়ে কী দেখতে পাব জানি না; তবু যাওয়া দরকার। সুযোগ যখন আশ্চর্যভাবে এসে গেছে তখন সেটার সদ্ব্যবহার না করার কোনও মানে হয় না।

সিধুজ্যাঠা বললেন, ছবিগুলো বিক্রি করে আমার হাতে কিছু কাঁচা টাকা এসেছে। আমি তার থেকে কিছুটা তোমাকে দিতে চাই। আফটার অল, আমার কথাতেই তো তোমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সুতরাং—

শুনুন, সিধুজ্যাঠা, ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকে এসেছে। ঠিকই, কিন্তু আমি যদি নিজে এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ না করতাম তা হলে এগোতাম না। আমি কাল রাত্রে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, আর যত ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে, আপনার কথাটা ষোলো আনা সত্যি। দেশের মন্দিরের গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে যারা বিদেশিদের বিক্রি করে, তাদের অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই।

ব্রাভো? সিধুজ্যাঠা চেঁচিয়ে উঠলেন। —তবে একটা কথা বলে রাখি। আর্থিক না। হলেও, অন্যরকম হেলপি তোমার লাগতে পারে। হয়তো আর্টের ব্যাপারে কোনও তথ্য জানার দরকার হতে পারে। তার

জন্য আমার কাছে আসতে দ্বিধা কোরো না। যদি সম্ভব। হয়, তুমি নিজেও একটু আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করে ফেলো-তা হলে উৎসাহটা আরও বেশি পাবে।

ঠিক হল মাথাটা যদি পাওয়া যায় তা হলে সেটা সোজা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসা হবে। কে চুরি করেছিল সেটা জানা না গেলেও, অন্তত –চোরাই জিনিসটা তো উদ্ধার হবে।

ঝড়ের স্পিডে তৈরি হয়ে নিয়ে একটা হলদে ট্যাক্সিতে চেপে আমরা যখন সিদিকপুরের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন ঠিক এগারোটা বাজতে পাঁচ। ফিরতে হয়তো বেলা হবে, এদিকে খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই-আমাদের বাড়িতে একটার আগে খাওয়া হয় না-তাই ঠিক হল ফেরার পথে যশোহর রোডে কোনও একটা পাঞ্জাবি দোকানে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওদিক দিয়ে লরি যাতায়াত করে। লরির লোকেরা এইসব দোকানে খায়। রুটি, মাংস, তাড়কা-দেখেই জিভে জল আসে। ফেলুদাকে দেখেছি ও সবরকম খাওয়াতে অভ্যস্ত। ওর দেখাদেখি আমিও সেই অভ্যাসটা করে নিতে চেষ্টা করছি।

কলকাতার ভিড় ছাড়িয়ে ভি আই পি রোডে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর দমদম ছাড়াবার কিছু পরেই মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল। হাসনাবাদ কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল। যশোহর রোড দিয়েই যেতে হয়। আমাদের ড্রাইভার বললেন রাস্তা পিছল না থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতেন। —ওদিকে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে জানেন তো স্যার? রেডিয়োতে বলল।

ফেলুদা যখন বলল যে ওই ক্র্যাশের জায়গাতেই আমরা যাচ্ছি, তখন ভদ্রলোক ভারী উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনার রিলেটিভ কেউ ছিল নাকি স্যার প্লেনে?

আজ্ঞে না।

ফেলুদার পক্ষে ব্যাপারটা খুলে বলা মুশকিল, অথচ ড্রাইভারবাবুর কৌতূহল মেটে না।

সব তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেচে শুনলাম। কিছু কি আর দেখতে পাবেন গিয়ে?

দেখা যাক।

আপনি কোনও সাংবাদিক-টাংবাদিক বোধহয়?

আজ্ঞে না।

তবে? গপ্পো-টপ্পো লিখি আর কী।

অ। দেখে-টেখে সব নোট-টোট করে পরে বইয়ে-টইয়ে লাগিয়ে দেবেন।

বারাসত ছাড়িয়ে মাইল দশেক যাবার পর থেকেই আমরা মাঝে মাঝে থেমে রাস্তার লোকের কাছ থেকে সিদিকপুরের নির্দেশ নিচ্ছিলাম। শেষটায় একটা বাজার টাইপের জায়গায় এসে একটা সাইকেলের দোকানের সামনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই তারা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল যে আর দু মাইল গেলেই বাঁদিকে একটা কাঁচা রাস্তা পড়বে, সেটা ধরে মাইল খানেক গেলেই সিদিকপুর। এদের হাবভাবে বোঝা গেল এরা অনেককেই আগে রাস্তা বাতলে দিয়েছে।

কাঁচা পথটা একেবারেই গেঁয়ো। মাঝে মাঝে জল জমেছে, আর নানারকম টায়ারের দাগ পড়েছে কাদার উপর। ভাগ্যে এটা জুন মাস, সবে বর্ষা পড়েছে। আর এক মাস পরে হলেই এ রাস্তা দিয়ে আর গাড়ি যেত না। আজ সকালের বৃষ্টিটা যে এদিকেও হয়েছে সেটা মাঠঘাটের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই শান্ত পাড়াগাঁয়ের মাঝখানে একটা ফকার ফ্রেন্ডশিপ জেট প্লেন ক্র্যাশ করেছে। ভাবতেও অবাক লাগিছিল। ইতিমধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে পর পর তিনখানা অ্যাম্বাসাডর মেন রোডের দিকে চলে গেল। পায়ে হাঁটা লোকও কিছু পথে পড়ল—কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরছে।

সামনে একটা মোড়ের মাথায় একটা বটগাছের ধারে বেশ ভিড়। একটু এগিয়ে কয়েকটা গাড়ি ও একটা জিপ রাস্তার ধারে দাঁড় করানো রয়েছে। আমাদের ট্যাক্সি সেই গাড়িগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্র্যাশের কোনও চিহ্ন নেই, তাও বুঝতে পারলাম। এখানেই আমাদের নামতে হবে। ডান দিকে কিছু দূরে একটা গাছপালায় ভর্তি জায়গা, তারও কিছু দূরে বাঁ দিকে একটা গ্রামের ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম সেটাই নাকি সিদিকপুর। ক্র্যাশের জায়গা, কোথায় জিজ্ঞেস করাতে বলল, ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনে। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন।

আমাদের ড্রাইভার (নামটা জেনে গেছি—বলরাম ঘোষ) গাড়িতে চাবি দিয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে ক্র্যাশ দেখতে। আমরা মাঠের মধ্যে হাঁটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে যেটাকে বন বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে আট-দশটা বড় বড় আম কঠাল তেঁতুল গাছ ছাড়া আর কিছুই না। সেগুলো পেরিয়েই একটা কলা বাগান, আর সেইখানেই যত কাণ্ড।

গাছের মধ্যে যেগুলো এখনও নেড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো সব কলসে কালো হয়ে গেছে। ডান দিকে কিছু দূরে একটা নেড়া গাছ, ফেলুদা বলল সেটা শিমুল। তার বড় বড় ডালগুলো যেন তলোয়ারের কোপে কেটে ফেলা হয়েছে, আর যা দাঁড়িয়ে আছে তা পুড়ে ছাই। সমস্ত জায়গাটা লোকজন পুলিশ এয়ারপোর্টের কর্মচারীতে ভরে আছে, আর তাদের আশেপাশে প্রায় একশো গজ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফকার ফ্রেন্ডশিপের ভগ্নাবশেষ। এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, ওইদিকে আবার থুবড়োনো নাকের খানিকটা। তা ছাড়া ভাঙাছেড়া ফাটাফুটা দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া আধাপোড়া সিকিপোড়া কত কী যে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। একটা অদ্ভুত কড়া গন্ধে চারিদিকটা ছেয়ে রয়েছে যেটার জন্য আমার নামেক রুমাল দিতে হল। ফেলুদা জিভ দিয়ে ছিক করে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল, যদি আর ঘণ্টাখানেক আগেও আসতে পারতাম!

আসলে, পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে, তাই কাছে যাবার কোনও উপায় নেই।

আমরা অগত্যা ঘেরাও-করা জায়গাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। পুলিশ মাটি থেকে জিনিস তুলে তুলে দেখছে। কোনওটাই আস্ত নেই, তবে ভাঙা বা আধাপোড়া অবস্থাতেও অনেক জিনিস দিব্যি চেনা যাচ্ছে। একটা স্টেথোস্কোপের কানো দেবার অংশ, একটা ব্রিফ কেস, জলের ফ্লাস্ক, একটা বাধহয় হ্যান্ডব্যাগের আয়না–যেটা একটা পুলিশ হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়ার ফলে তার থেকে রোদের ঝিলিক বেরোচ্ছে।

আমাদের ডান দিকে ক্র্যাশের জায়গা, আমরা তার পাশ দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁ দিকের একটা আমগাছের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

একটা ছেলে গাছের একটা নিচু ডালের উপর উঠে বসেছে, তার হাতে একটা কালসিটে পড়া সু-জুতো, যেটা নিশ্চয়ই চামড়ার ছিল, আর যেটা নিশ্চয়ই ছেলেটা এই জঞ্জালের মধ্যে থেকেই পেয়েছে।

ফেলুদা ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

তোরা অনেক জিনিস পেয়েছিস এই জঞ্জাল থেকে, না রে?

ছেলেটা চুপ। সে একদৃষ্টি ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে।

কী হল? বোবা নাকি?

ছেলেটা তাও চুপ। ফেলুদা হাপলেস বলে এগিয়ে চলল ক্র্যাশের জায়গা ছেড়ে গ্রামের দিকে! বলরামবাবুর কৌতুহল আবার চাগিয়ে উঠেছে। বললেন, আপনি কিছু খুঁজছেন নাকি স্যার?

একটা লাল পাথরের মূর্তি, ফেলুদা জবাব দিল,–শুধু মাথাটা।

শুধু মাথাটা...হুঁ... বলে বলরামবাবু দেখি এদিক ওদিক ঘাসের উপর খোঁজা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের তলায় একটা বাঁশের মাচা; তার উপর তিনজন আধাবুড়ো বসে তামাক খাচ্ছে। যে সবচেয়ে বুড়ে সে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোত্থিকে আয়লেন?

কলকাতা। খুব জোর বেঁচে গেছে আপনাদের গ্রামটা!

হাঁ তা গ্যাচে বাবু। আল্লার কৃপা ঘর-বাড়ি ভাঙেনি মানুষজন মরেনি-বাছুর একটা বাঁধা ছিল করিমুদ্দির সেডা মোরেচে। আর আলম শ্যাখের–

আগুন লাগল কখন?

আগুন আর ধোঁয়া গোটা গেরামটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া। আর তারপর অ্যালো বৃষ্টি, দমকল অ্যালো–

দমকল আসা অবধি আগুন জ্বলছিল?

আগুন নেভেছে বৃষ্টির জলে।

আপনি কাছাকাছি গিয়েছিলেন আগুন নেভার পর?

আমি বুড়ো মানুষ আমার অতো কী গরজ...

ছেলে ছাকরারা যায়নি? ওখান থেকে জিনিসপত্তর তুলে নেয়নি?

বুড়ো চুপ। অন্য দুজনও উসখুস। করছে। ইতিমধ্যে আট দশজন ছেলে জড়ো হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। ফেলুদা তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোর নাম কী রে?

ছেলেটি ঘাড় কত করে বলল, আলি।

এদিকে আয়।

ফেলুদা নরম সুরে কথা বলছিল বলেই বাধহয় ছেলেটা এগিয়ে এল।

ফেলুদা তার কাঁধে হাত দিয়ে গলাটা আরও নামিয়ে বলল, ওই ভাঙা প্লেনটা থেকে অনেক জিনিস ছড়িয়ে বাইরে পড়েছিল, জনিস তো?

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা লাল পাথরের তৈরি মেয়েমানুষের মাথা ছিল। কুমোর যেমন মাথা গড়ে, সেইরকম মাথা।

এই ও জানে।

আলি আরেকজন ছেলের দিকে দেখিয়ে দিল। ফেলুদা একেও জিজ্ঞেস করল, তোর নাম কী রে?

পানু।

ফেলুদা বলল, আর কী নিয়েচিস তা আমার জানার দরকার নেই; মাথাটা ফেরত দিলে তোকে আমি বিকশিশী দেব।

পানুর মুখেও কথা নেই।

বাবু জিজ্ঞেস করচে জবাব দে-, তিন বুড়োর এক বুড়ো ধমক দিয়ে উঠল।

ওর কাছে নেই।

কথাটা বলল পানুরই বয়সী, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আরেকটি ছেলে।

কোথায় গেল? চাবুকের মতো প্রশ্ন করল ফেলুদা।

আরেকজন বাবু এসেচিল, তিনি চাইলেন, তাকে দিয়ে দিয়েচে।

সত্যি কথা? ফেলুদা পানুর কাঁধ ধরে প্রশ্ন করল। আমার বুক টিপটিপ করছে। পেতে পেতেও ফসকে যাবে যক্ষীর মাথা? পানু এবার মুখ খুলল।

একজন বাবু এলেন যে গাড়ি করে একটুক্ষণ আগে।

কীরকম গাড়ি?

নীল রঙের !-তিন চারটি ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল।

কীরকম দেখতে বাবু? লম্বা? রোগ? মোটা? চশমা পরা?...

ছেলেদের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল। মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, প্যান্ট শার্ট পরা, রোগাও না মোটাও না ফরাসাও না কলোও না, বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে; আমরা এসে পৌঁছানোর আধা ঘণ্টা আগে এসে একে তাকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে পানুর কাছ থেকে সামান্য কিছু বকশিশ দিয়ে একটা লাল পাথরের তৈরি মানুষের মাথা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। তার নীল রঙের গাড়ি।

আমরা যখন গ্রামের পথ দিয়ে গাড়িতে করে আসছিলাম তখন উলটো দিক থেকে একটা নীল রঙের অ্যাম্বাসাডরকে আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

চল তোপসে—আসুন বলরামবাবু! খবরটা শুনে ফেলুদা যদি হতাশও হয়ে থাকে, সে ভাবটা যে সে এর মধ্যে কাটিয়ে উঠে আবার নতুন এনার্জি পেয়ে গেছে সেটা তার ট্যাক্সির উদ্দেশে দৌড় দেখেই বুঝলাম। আমরাও দুজনে ছুটলাম তাঁর পিছনে। কী আছে কপালে কে জানে!

০৩. যে পথে এসেছিলাম

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার ফিরে চলেছি। দেড়টা বেজে গেছে, কিন্তু খাওয়ার কথা মনেই নেই। যশোহর রোডে পড়ে বলরামবাবু একবার বলেছিলেন, চা খাবেন নাকি স্যার? গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে.... ফেলুদা সে কথায় কান দেয়নি। বলরামবাবুও বোধহয় ব্যাপারটায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে আর চায়ের কথা বলেননি।

গাড়ি পঁচাত্তর কিলোমিটার স্পিডে ছুটে চলেছে, আর আমি ভাবছি কী অল্পের জন্যেই না মাথাটা ফসকে গেল। সকালে যদি লোডশেডিংটা না হত, আর রেডিয়োর খবরটা যদি ঠিক সময়ে শুনতে পেতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়তো আমরা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে ছুটে চলেছি। কিংবা হয়তো সোজা ভুবনেশ্বর। মন্দিরের গায়ে ভাঙা মূর্তি আবার জোড়া লেগে যেত, আর ফেলুদা তার জোরে হয়তো পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী হয়ে যেত।

এই এক ঘণ্টার রোদেই রাস্তা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মনে মনে ভাবছি। বলরামবাবু আরেকটু স্পিড তুললে পারেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ায় পালস রেট-টা ধাঁ করে বেড়ে গেল।

একটা গাড়ি-মেরামতের দোকানের সামনে একটা নীল অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে আছে।

বলরামবাবু যে সিদিকপুরের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছিলেন সেটা তার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম। —গাড়ি থামাব স্যার?

সামনের চায়ের দোকানটায়, ফেলুদা চাপা গলায় জবাব দিল।

বলরামবাবু স্টাইলের মাথায় মেরামতির দাকানের দুটো দোকানের পরে ট্যাক্সিটাকে রাস্তার ডান দিকে নিয়ে গিয়ে ঘর্য্য-ষ করে ব্রেক কষলেন। ফেলুদা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তিন কাপ চা অডার দিল। কাপ তো নয়, কাচের গেলাস।

আর কী আছে ভাই?

বিস্কুট খাবেন? ভাল বিস্কুট আছে।

কাচের বায়ামের মধ্যে গাল গাল নানখাটাই টাইপের বিস্কুট, ফেলুদা তারই দুটো করে দিতে বলল।

আমার চোখ নীল অ্যাম্বাসাডারের দিকে। পাংচার সারানো হচ্ছে। একটি ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, মাঝারি রং, বয়স চল্লিশ-টল্লিশ, ঘন ভুরু, ঘন হাতের লোম, কনের পাশ দিয়েও বোধহয় লোম বেরিয়েছে, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। গাড়ির পাশে ছটফট ভাব করে পায়চারি করছেন আর ঘন ঘন টান দিচ্ছেন আধপোড়া সিগারেটে। বাঙালি কি? কথা না বললে বোঝার উপায় নেই।

চা তৈরি হচ্ছে। ফেলুদা চারমিনার বার করে একটা মুখে পুরে পকেট চাপড়ে দেশলাই না-পাওয়ার ভান করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। আমি আমাদের ট্যাক্সির কাছেই রয়ে গেলাম। দুই গাড়ির মধ্যে তফাত বিশ-পঁচিশ হাত। বলরামবাবুর আড়াচোখ নীল গাড়ির দিকে।

এক্সকিউজ মি, আপনার কাছে কি...

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে জ্বলিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

থ্যাঙ্কস। ফেলুদা ধোঁয়া ছাড়ল। টেরিবল ব্যাপার!

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

আপনি তো ক্র্যাশের ওখানে গিয়েছিলেন, ফেলুদা বলল। —আপনার গাড়িটা যেন আসতে দেখলাম...?

ক্র্যাশ?

আপনি জানেন না? কাঠমাণ্ডুর প্লেন...সিদিকপুরে...

আমি টাকি থেকে আসছি।

টাকি হল হাসনাবাদের কাছেই একটা শহর।

আমরা কি তা হলে ভুল করলাম? গাড়ির নম্বরটা যদি দেখে রাখতাম তা হলে খুব ভাল

হত।

আর কতক্ষণ লাগবে হে? ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন মেরামতির লোকটাকে। এই হয়ে গেল স্যার। পাঁচ মিনিট। চায়ের দোকান থেকে বলরামবাবু হাঁক দিয়ে জানালেন চা রেডি। ফেলুদা নীল

গাড়ি ছেড়ে আমাদের হলদে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। হাতে গেলাস নিয়ে তিনজনে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসার পর ফেলুদা চাপা গলায় বলল, ডিনাই করছে। ডাহা মিথ্যেবাদী।

আমি বললাম, কিন্তু নীল অ্যাম্বাসাডর তো আরও অনেক আছে। এ রংটা তো খুব কমন, ফেলুদা।

লোকটার জুতোয় এখনও কালো ছাইয়ের দাগ লেগে আছে। তোর নিজের স্যান্ড্যালটার দিকে চেয়ে দেখেছিস একবার?

সত্যিই তো! স্যান্ড্যালের রংটাই বদলে গেছে। ক্র্যাশের জায়গায় গিয়ে। আর ওই ভদ্রলোকেরও তাই। ব্রাউন জুতোয় কালোর ছোপ।

ফেলুদা যে ইচ্ছে করেই ধীরে সুস্থে বিস্কুট খাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট পরে অন্য গাড়িটা সুস্থ অবস্থায় মেরামতির দোকান থেকে বেরিয়ে যশোহর রোড দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। আর তার পরমুহূর্তেই আমাদের গাড়িও ধাওয়া করল তার পিছনে। দুটোর মাঝখানে বেশ অনেকখানি ফাঁক, কিন্তু ফেলুদা বলল সেই ভাল; লোকটার সন্দেহ উদ্রেক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দমদমের কাছে এসে হঠাৎ আরেক পশলা বৃষ্টি নামল। সামনে সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, ভাল দেখা যাচ্ছে না, তাই বলরামবাবুকে বাধ্য হয়েই স্পিড বাড়িয়ে নীল গাড়ির আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে পড়তে হল। ভদ্রলোক বেশ রসিক; বললেন, হিন্দি ফিল্মের মতন মনে হচ্ছে স্যার। সেদিন শত্রুঘনের একটা বইয়ে দেখলুম। এইভাবে গাড়ির পেছনে গাড়ি ফলো করছে। অবিশ্যি সেখানে পেছনের গাড়িটা একটা পাহাড়ের গায়ে ক্র্যাশ করল।

ফেলুদা বলল, এক'দিনে একটা ক্র্যাশই যথেষ্ট। আপনি স্টেডি থাকুন। কলকাতায় পাহাড় না থাকলেও—

কী বলচেন স্যার! থাটিন ইয়ারস গাড়ি চালাচ্ছি-এখনও পর্যন্ত একটিও নষ্ট এ সিঙ্গল অ্যাক্সিডেন্ট।

ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রি ফোর নাইন, ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল। আমিও নম্বরটা মাথায় রেখে দিলাম, আর বার বার পাঁতিচান, পতিচান, পতিচান আওড়ে নিলাম। এটা আর কিছুই নয়–পাঁচ তিন চার আর নায়ের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি। নম্বর মনে রাখার দু-তিন রকম উপায় ফেলুদা শিখিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে এটা একটা।

বলরামবাবু সত্যিই বাহাদুর ড্রাইভার, কারণ কলকাতার ট্র্যাফিকে ভরা গিজগিজে রাস্তা দিয়েও ঠিক নীল গাড়িকে সামনে রেখে চলেছেন। কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা কে জানে।

মূর্তিটা নিয়ে কী করবে বলে তো লোকটা? শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে।ভুবনেশ্বরে ফেরত নিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। যে জাতের ধুরন্ধর, তাতে মনে হয় আবার আরেকজন বিদেশি খদ্দের জোগাড় করার চেষ্টা করবে। একই জিনিস উপরো-উপরি দুবার বিক্রি করার এমন সুযোগ তো চট করে আসে না।

নীল গাড়ি শেষ পর্যন্ত দেখি আমাদের পার্ক স্ট্রিটে এনে ফেলেছে। পুরনো গোরস্থান ছাড়িয়ে, লাউডন স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিটের মোড় ছড়িয়ে শেষে গাড়ি দেখি হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কুইন্‌স ম্যানসনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

যাব সারা?

অ্যালবৎ।

আমাদের ট্যাক্সিও গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকাল। একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা; তার মাঝখানে একটা পার্ক, আর চারদিকে ঘিরে রয়েছে পাঁচ-ছাতলা উঁচু সব বাড়ি। পর্কের চারদিকে গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, তার মধ্যে আবার দু-একটা স্কুটারও রয়েছে; আমাদের ডান দিকে কুইনস ম্যানসন। আমরা ট্যাক্সি দাঁড় করলাম, নীল গাড়ি কিছু দূরে একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল। আমরা গাড়ির ভিতরে বসে আছি কী হয় দেখার জন্য।

ভদ্রলোক একটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে নামলেন, দরজার কাচ তুললেন, দরজা লক করলেন, তারপর ডান দিকে গিয়ে একটা বড় দরজা দিয়ে কুইনস ম্যানসনে ঢুকে গেলেন।

এক মিনিট অপেক্ষা করে ফেলুদাও ট্যাক্সি থেকে নামল আমি তার পিছনে। সোজা চলে গেলাম সেই দরজার দিকে। একটা ঘড় ঘড় শব্দ আগেই কানে এল; গিয়ে দেখি দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা আদ্যিকালের লিফট, সেটা সবেমাত্র নীচে নেমেছে। ঝটপটাং শব্দ করে লোহার কোলাপসিবল দরজা খুলে বুড়ো লিফটম্যান খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা হঠাৎ একটা ব্যস্ততার ভাব করে তাকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার সেনগুপ্ত এইমাত্র ওপরে গেলেন না?

সেনগুপ্ত কোন?

এইমাত্র যিনি ওপরে গেলেন?

আভভি গিয়া পাঁচ নম্বরকা মিস্টার মল্লিক। সেনগুপ্ত ইহা কোই নেহি রহ্‌তা।

ও। আমারই ভুল।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট। মিস্টার মল্লিক। এগুলো মনে রাখতে হবে। ফেলুদা খাতা আনেনি; বাড়ি গিয়ে নোট করে নেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু বাড়ি ফিরতে যে এখনও দেরি সেটা একটু পরেই বুঝলাম। ফেলুদা বলরামবাবুকে ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দিল, ভদ্রলোক যাবার সময় একটা স্লিপ দিয়ে বলে গেলেন, এটা আমার পাশের বাড়ির টেলিফোন, আপনি বললে আমায় ডেকে দেবে। দরকার-টরকার পড়লে একটু খবর দেবেন। স্যার। একঘেয়ে কাজের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে...।

পার্ক স্ট্রিট থানার ও সি মিস্টার হরেন মুৎসুদ্দির সঙ্গে ফেলুদার আলাপ ছিল। দু বছর। আগে হ্যাঁপি-গো-লাকি বলে একটা রেসের ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে মারার রহস্য ফেলুদা আশ্চর্যভাবে সমাধান করেছিল; তখনই মুৎসুদ্দির সঙ্গে আলাপ হয়। আমরা এখন তাঁর আপিসে। ভদ্রলোক মূর্তি চুরির খবরটা কাগজে পড়েছেন। ফেলুদা সেইখান থেকে শুরু করে আজকের পুরো ঘটনাটা তাঁকে বলে বলল, যদ্দূর মনে হয় এই মল্লিক চুরির ব্যাপারটা নিজে না করলেও, চোরাই মাল উদ্ধার করে সেটাকে পাচার করার ভারটা নিজেই নিয়েছে। তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইনফরমেশন, আর একটি লোক তাঁর পিছনে রাখা—এই দুটো অনুরোধ করতে আমি এসেছি। তার কার্যকলাপের দিকে একটু নজর রাখা দরকার। মিস্টার মল্লিক, পাঁচ নম্বর কুইনস ম্যানসন, নীল অ্যাম্বাসাডর, নম্বর ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রি ফোর নাইন।

মুৎসুদ্দি এতক্ষণ একটা পেনসিল কানের মধ্যে খুঁজে বসেছিলেন, এবার সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, হবে। আপনি যখন বলছেন তখন হবে। একটা স্পেশাল কনস্টেবল লাগিয়ে দিচ্ছি, সে ওকে চোখে চাখে রাখবে। আর আমাদের ফাইলে যদি কিছু থাকে তাও দেখছি। থাকবেই যে এমন কোনও কথা নেই, যদি না লোকটা এর আগে কোনও গণ্ডগোল করে পুলিশের নজরে এসে থাকে।

ব্যাপারটা খুব আর্জেন্ট কিন্তু। মূর্তি আবার বেহাত হলেই মুশকিল।

মুৎসুদ্দি মুচকি হেসে বললেন, কেন, মুশকিল কেন? আমরা তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটি না, মিস্টার মিত্তির। আপনি একা ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা কি আর রিফিউজ করব? আমরা আছি কীসের জন্য? পাবলিককে হেলপ করার জন্যেই তো? তবে একটা কথা বলি–একটা অ্যাডভাইস, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড-এই সব র্যাকেটের পেছনে মাঝে মাঝে এক একটা দল থাকে-গ্যাং-এবং তারা বেশ পাওয়ারফুল হয়। গায়ের জোর বলছি না। পয়সার জোর। পোজিশনের জোর। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকেরা যখন নোংরা কাজে নামে, তখন সাধারণ ক্রিমিন্যালদের চেয়ে তাদের বাগে আনা অনেক বেশি শক্ত হয়, জানেন তো? আপনি ইয়াং, ট্যালেন্টেড, তাই আপনাকে এগুলো বলছি।–নইলে আর আমার কী মাথাব্যথা বলুন!...

ওয়ালডর্ফে চিনে খাবার অডার দিয়ে ফেলুদা ম্যানেজারের ঘর থেকে কুইন্‌স ম্যানসন পাঁচ নম্বরে একটা টেলিফোন করে, হ্যালো শুনেই ফোনটা রেখে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, লোকটা এখনও ঘরেই আছে।

আমরা বাড়ি ফিরলাম পীনে তিনটেয়। চারটের কিছু পরে মিস্টার মুৎসুদ্দির টেলিফোন এল। প্রায় পাঁচ মিনিট কথা হল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা তার খাতায় নোট করে নিল। তারপর আমি না জিজ্ঞেস করতেই আমার কৌতুহল মিটিয়ে দিল। —

লোকটার পুরো নাম জয়ন্ত মল্লিক। দিন পনেরো হল কুইনস ম্যানসনে এসে রয়েছে। ফ্ল্যাটটা আসলে মিস্টার অধিকারী বলে একজন ভদ্রলোকের। ইনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক রেস্টোরেন্টের মালিক। বোধহয় মল্লিকের বন্ধু। অধিকারী এখন দার্জিলিঙ-এ। তার অবর্তমানে মল্লিক ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করছে। গাড়িটাও অধিকারীর। সেই গাড়ি করেই মল্লিক আজ তিনটে নাগাদ গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর আবার ভিতরে ঢেকে। দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে করে ডালহৌসি যায়। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য মুৎসুদ্দির লোক ওকে হারিয়ে ফেলে, তারপর ফেয়ারলি প্লেসে রেলওয়ে বুকিং আপিসের বাইরে গাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে দেখে, মল্লিক। কিউয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে। এখান থেকে মনমড়, সেখান থেকে আওরঙ্গাবাদ। সেকেণ্ড ক্লাসের রিজার্ভ টিকিট। আরও খবর থাকলে পরে টেলিফোন করবে।

আওরঙ্গাবাদ যাচ্ছে? আমি জায়গাটার নামই শুনিনি।

আওরঙ্গাবাদ, ফেলুদা বলল। আর আমরা এখন যাচ্ছি সদার শঙ্কর রোড, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বোসের বাড়ি। একটা কনসালটেশনের দরকার।

০৪. আওরঙ্গাবাদ

আওরঙ্গাবাদ!

সিধুজ্যাঠার চোখ কপালে উঠে গেল। —এ যে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি! জায়গাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ ফেলু? আওরঙ্গাবাদ হল এলোরায় যাবার ঘাঁটি। মাত্র বিশ মাইলের পথ, চমৎকার রাস্তা। আর এলোরার মানে বুঝতে পারছ তো? এলোরা হল ভারতের সেরা আর্টের ডিপো! পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা কৈলাসের মন্দির-যা দেখে মুখের কথা আপন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আর তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে লাইন করে দেড় মাইল জায়গা জুড়ে আরও তেত্রিশটা গুহা-হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন-তার প্রত্যেকটা মূর্তি আর কারুকার্যে ঠাসা। আমার তো ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে!...কিন্তু প্লেন থাকতে ট্রেনে যাচ্ছে কেন লোকটা?

যদ্দূর মনে হয়, মূর্তিটা ও হাতের কাছে রাখতে চাইছে। প্লেনে গেলে সিকিউরিটি চেক-এর ব্যাপার আছে। হাতের ব্যাগ খুলে দেখে পুলিশ। ট্রেনে সে ঝামেলা নেই।

আওরঙ্গাবাদের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমারও গলা শুকিয়ে গেল। ফেলুদা হাতের ঘড়ির দিকে দেখে তড়াক করে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল।

কী ঠিক করলে? সিধুজ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন।

আমাদের প্লেনেই যেতে হবে।

সিধুজ্যাঠা যে ভাবে ফেলুদার দিকে চাইলেন তাতে বুঝলাম গর্বে ওঁর বুকটা ভরে উঠেছে। মুখে কিছু না বলে তক্তপোশ থেকে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা চটি বই বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমায় হেলপ করবে। ভাল করে একবারটি পড়ে নিয়ো।

বইটার নাম এ গাইড টু দ্য কেভস অফ এলোরা।

ফেলুদা বাড়ি এসেই জুপিটার ট্র্যাভলসের মিস্টার বকসীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল। আগামীকাল সকালের বম্বে ফ্লাইটে টিকিট আছে কি না; ওর তিনটে সিটি দরকার। তিনটে শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সিধুজ্যাঠাও যাবেন নাকি সঙ্গে? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও শুধু বলল, দলে আরেকটু ভারী হলে সুবিধে হয়।

বকসী বললেন, এমনিতে জায়গা নেই, তবে ওয়েটিং লিস্টে ভাল পোজিশন। আমি টিকিট ইসূ্যু করে দিচ্ছি। আপনারা সকলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এয়ারপোর্টে এসে যাবেন। মনে হয় হয়ে যাবে।

সকালের ফ্লাইট নটার মধ্যে বম্বে পৌঁছে যাবে; তারপর সেখান থেকে সাড়ে বারোটার সময় আরেকটা প্লেন ছেড়ে দেড়টায় আমাদের আওরঙ্গাবাদ পৌঁছে দেবে। এই পরের টিকিটটাও জুপিটার করে দেবে, আর দেবে আমাদের আওরঙ্গাবাদ ও এলোরার থাকার ব্যবস্থা। আমরা পৌঁছে যাব কালই, মানে শনিবার, আর মল্লিক পৌঁছবেন রবিবার।

বুকিং-এর ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুদা আরেকটা নম্বর ডায়াল করছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি নাম্বার ওয়ান জনপ্রিয় রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। ফেলুদা যেন ভূত দেখেছে এমন ভাব করে রিসিভারটা রেখে দিয়ে বলল, আশ্চর্য-এই মুহূর্তে আপনার নম্বর ডায়াল করছিলাম।

জটায়ু তার ভাঁজ করা প্লাস্টিকের রেনকোটটা টেবিলের উপর রেখে সোফায় বসে পড়ে বললেন, তা হলে আমার সঙ্গে আপনার একটা টেলিপ্যাথেটিক যোগ রয়েছে বলুন! আমারও ক'দিন থেকেই আপনার কথা মনে হচ্ছে।

কথাটা আসলে হবে টেলিপ্যাথিক, কিন্তু লালমোহনবাবুর ইংরেজি ওইরকমই। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে; দেখে মনে হল বই লিখে বেশ দু পয়সী। রোজগার হচ্ছে।

বেশ করে একটু লেবুর সরবত করতে বলুন তো আপনার সারভেন্টটিকে-বড্ড গুমোট করেছে। আর ফ্রিডিজেয়ার থেকে যদি একটু বরফ দিয়ে দেয়...

সরবতের আড়ার দিয়ে ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

খুব ব্যস্ত নাকি? নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন?

হাত দিলে কি আর এখানে আসতে পারি? ছক কেটিচি। খুব জমবে বলে মনে হয়। ভাল ফিলিম হয়। অবিশ্যি হিন্দি প্যাটার্নের। পাঁচখানা ফাইট আছে। বেলুচিস্তানের ব্যাকগ্রাউন্ডে ফেলিচি আমার হিরো প্রখর রুদ্রকে। আচ্ছা-অর্জ্জুন মেরহাত্রাকে কেমন মানায় বলুন তো হিরোর পার্টে? অবিশ্যি আপনি যদি অ্যাকটিং করতে রাজি হন তা হলে তো–

আমি হিন্দি জানি না। যাই হাক, আপাতত আমাদের সঙ্গে আসুন-কৈলাসটা ঘুরে আসি। ফিরে এসে না হয় বেলুচিস্তানের কথা ভাববেন।

কৈলাস। সে কী মশাই–আপনার কি তিব্বতে কেস পড়ল না কি? সেখানে তো শুনিচি চিনেদের রাজত্ব।

কৈলাস পাহাড় নয়। কৈলাস মন্দির। এলোরার নাম শুনেছেন?

ও হা হা, তাই বলুন। তা সে তো শুনিচি সব মন্দির আর মূর্তি টুর্তির ব্যাপার। আপনি হঠাৎ পাথর নিয়ে পড়লেন কেন? আপনার তো মানুষ নিয়ে কারবার।

কারণ, কতগুলো মানুষ ওই পাথর নিয়ে একটা কারবার কেঁদে বসেছে। বিশ্রী কারবার। সেটা বন্ধ করা দরকার।

লালমোহনবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সব শুনেটুনে লালমোহনবাবুর গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে কী সব লিখেটিখে নিয়ে বললেন–

এ এক নতুন খবর দিলেন। আপনি। এই সব পাথরের মূর্তির এত দাম? আমি তো জানতুম হিরে পান্না চুনি–এই সব হল দামি পাথর। যাকে বলে প্রেশাস স্টোনস। কিন্তু এও তো দেখছি কম প্রেশাস নয়।

আরও বেশি প্রেশাস। চুনি পান্না পৃথিবীতে হাজার হাজার আছে, ভবিষ্যতে সংখ্যায় আরও বাড়বে। কিন্তু কৈলাসের মন্দির বা সাঁচির স্তূপ বা এলিফ্যান্টার গুহা-এ সব একটা বই দুটো নেই। হাজার-দু হাজার বছর আগে আমাদের আর্ট যে হাইটে উঠেছিল। সে হাইটে ওঠার কথা আজকের আর্টিস্ট ভাবতেই পারে না। সুতরাং সে যুগের আর্ট দেশে যা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যারা তাকে নষ্ট করতে চায় তারা ক্রিমিনাল। আমার মতে ভুবনেশ্বরের যক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে। যে করেছে তার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।

লালমোহনবাবুকে ততবার জন্য এ-ই যথেষ্ট। এমনিতেই ভদ্রলোকের নতুন দেশ দেখার শাখ, তার উপর ফেলুদার সঙ্গে একজন অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করা-সব মিলিয়ে ভদ্রলোক ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। প্লেনের টাইম, জামা-কাপড় কী নিতে হবে, মশারি লাগবে কি না, সাপের ওষুধ লাগবে কি

না ইত্যাদি জেনে নিয়ে উঠে পড়ে বললেন, আমার আরও একসাইটেড লাগছে কেন জানেন তো? কৈলাস নামটার জন্য। কৈলাস-কই লাশ! বুঝতে পারছেন তো?

ক’দিনের জন্য যাচ্ছি জানা নেই, তবে দিন সাতেকের বেশি হবে না। আন্দাজ করে প্যাকিং সেরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। ফেলুদাকে প্রায়ই তদন্তের ব্যাপারে বাইরে যেতে হয়, তাই ওর একটা আলাদা সুটকেসে কিছু জরুরি জিনিস আগে থেকেই প্যাক করে রেডি করা থাকে। তার মধ্যে ওষুধপত্র, ফাস্ট-এড বক্স, মেক-আপ বক্স, বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ক্যামেরা, ইস্পাতের তৈরি পঞ্চাশ ফুট টেপ, একটা অল-পারপাস নাইফ, নানারকম সরু সরু তারা-যা দিয়ে দরকার হলে চাবি ছাড়াই তালা-টালা খোলা যায়, একটা নিউম্যান কোম্পানির ব্র্যাড্‌শ-বা রোল-প্লেন-বাসের টাইম টেবল, একটা রোড ম্যাপ, একটা লম্বা দড়ি, এক জোড়া হান্টিং বুট। এতে জায়গা যে খুব একটা বেশি নেয় তা নয়; তাই একই সুটকেসে ওর বাকি জিনিসও ধরে যায়। জামা-কাপড় বেশি নেয় না। এককালে পোশাকের শখ ছিল, এখন কমে গেছে। সিগারেট খাওয়াও দিনে বিশটা থেকে দশে নেমে গেছে। স্বাস্থের ব্যাপারে ওর চিরকালই যত্ন। যোগব্যায়াম করে, একগাদা খায় না, তবে নতুন গুড়ের সন্দেশ বা খুব ভাল মিহিদানা পেলে সংযমের তোয়াক্কা রাখে না।

ফেলুদার কাছে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো চটি বই ছিল, তার মধ্যে এবার যেগুলো লগতে পারে তার কয়েকটা নিয়ে আমি উলটেপালটে দেখে নিলাম। দশটা নাগাদ শোবার আগে ফেলুদা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল, আর যদি কোনও কারণে অ্যালার্ম না বাজে তাই ওয়ান সেভেন থ্রিতে টেলিফোন করে সকালে চারটের সময় ঘুম ভাঙিয়ে দেবার কথা বলে দিল।

তার ঠিক দশ মিনিট বাদে মিস্টার মুৎসুদ্দির কাছ থেকে ফোন এল। বললেন, মল্লিক বম্বে থেকে একটা ট্রাঙ্ক কল পেয়েছিল কিছুক্ষণ আগে! মল্লিক যে কথাগুলো বলে তা হল এই—মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে গেছে। বাপ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বিশ পঁচাত্তর। তাতে বম্বের লোক ইংরেজিতে বলে, ক্যারি অন। বেস্ট অফ লাক।

আমি কথাগুলোর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। সেটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, তোর মাধ্যমীনারায়ণ তেলের দরকার হয়ে পড়েছে।

ভাগ্যিস এই তেলের ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, তা না হলে এটারও মানে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হত। মধ্যমনারায়ণ তেল মাথায় লাগালে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয়। আর বুদ্ধি বাড়ে।

বম্বের প্লেন সাড়ে ছটায় না ছেড়ে ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। বেশ কয়েকটা ক্যানসেলেশন ছিল, তাই আমাদের জায়গা পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছিলেন লালমোহনবাবু; এটা বোধ হয়। দ্বিতীয়বার। এবার দেখলাম টেক-অফের সময় দাঁত-টাত খিঁচিয়ে সেই বিশ্রী ব্যাপারটা আর করলেন না। কিন্তু প্রথম দিকটা যখন আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন প্লেনটা বেশ ধড়ফড় করছিল, আর লালমোহনবাবুর অবস্থা আরও অনেকেরই মতো বেশ শোচনীয় বলে মনে হচ্ছিল। একবার একটা বড় রকম ঝাঁকুনির পর ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে বললেন, এ যে মশাই চিৎপুর রোড় দিয়ে ছাকড়া গাড়িতে করে চলছি বলে মনে হচ্ছে!! নাটবলুন্টু সব খুলে আসচে না তো?

আমি আর ফেলুদা দুটো পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম, আর লালমোহনবাবু বসেছিলেন প্যাসেজের ওদিকে ফেলুদার ঠিক পাশেই। ব্রেকফাস্ট খাবার কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক একবার ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, দাঁর-খড়কের ইংরেজি কী মশাই? তারপর সেটা জেনে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই বোতাম টিপে এয়ার হাস্টেসকে ডাকিয়ে এনে, এক্সকিউজ, টুথপিক প্লিজ বলে খড়কে আদায় করে নিলেন। তারপর ঘণ্টা খানেক পরে বম্বে সম্বন্ধে একটা বুকলেট পড়তে পড়তে বললেন, অ্যাপোলোটা আবার কীরকম বাঁদর মশাই?

ফেলুদা এলোরার গাইড বুকটা চোখের সামনে থেকে নামিয়ে বলল, বাঁদর নয়, বন্দর। পোর্ট।

ও, পোর্ট! তা হলে ইংরিজিতে পোর্ট লিখলেই হয়, বান্দার লেখার কী দরকার? হুঁ!

আমরা তিনজনের কেউই আগে বম্বে যাইনি। পশ্চিমে সবচেয়ে দূরে গেছি। রাজস্থানের জয়সলমীর। এবার এমনিতে বম্বেতে থাকার কথা নয়, তবে ফেলুদা বলেছে এলোরায় সব ঠিক ভাবে উতরে গেলে ফিরবার পথে দু-তিনদিন বম্বে থেকে আসবে। ওর এক কলেজের বন্ধু ওখানে থাকে, গ্ল্যাক্সো কোম্পানিতে কাজ করে, সে অনেক’দিন থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে!

প্লেন ল্যান্ড করার আগে যখন বেল্ট বাঁধতে বলছে, তখন আমি ফেলুদাকে একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। বললাম, মল্লিকের কাল রাত্রের টেলিফোনের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে?

ফেলুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

সে কী রে-তুই, ওটা সত্যিই বুঝিসনি?

উহুঁ।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। মেয়ে হল যক্ষীর মাথা, শ্বশুরবাড়ি হল সিলভারস্টাইন—যে মাথাটি কিনেছিল, আর বাপের বাড়ি হল মল্লিক—যার কাছে মাথাটা ছিল।

বুঝিয়ে দিলে সত্যিই জলের মতো সোজা। বললাম, আর বিশ-পঁচাত্তর?

ওটা ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড। ম্যাপ খুলে দেখবি ওটা আওরঙ্গাবাদে পড়ছে।

স্যান্টাকুজ এয়ারপোর্টে নামলাম দশটার সময়। আড়াই ঘণ্টা পরে আবার প্লেন ধরতে হবে, তাই শহরে যাবার কোনও মনে হয় না— যদিও আকাশ থেকে শহরের গমগমে চেহারা দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্টের বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে রেস্টোরান্টে ভাত আর মুরগির কারি খেয়ে আওরঙ্গাবাদ যাবার প্লেনে উঠলাম পৌনে একটায়। মাত্র এগারোজন যাত্রী। ফেলুদা বলল এটা টুরিস্ট সিজন নয়। তাই এত কম লোক। আওরঙ্গাবাদে যারা যায় তারা অনেকেই নাকি অজন্তা—এলোরা দেখতেই যায়।

এবার আমি আর লালমোহনবাবু পাশাপাশি, আর প্যাসেজের উলটা দিকে ফেলুদা, আর তার পাশে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক—তার চোখে মোটা কালো চশমা, নাকাটা খাঁড়ার মতো লম্বা। আর ব্যাকা, আর চওড়া কপালের পিছন দিকে একরাশ কাঁচাপাকা ঢেউ খেলানো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। আওরঙ্গাবাদের খুদে এয়ারপোর্টে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। হত না, কিন্তু তাঁর নাকি গাড়ি আসার কথা ছিল, আসেনি, তাই উনি আমাদের সঙ্গে এয়ারলাইনসের বাসে শহরে এলেন। বাঙালি বলে মনে হয়নি, তাই যখন ফেলুদার সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন তখন বেশ অবাক লাগল।

কোথায় উঠছেন? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

আওরঙ্গাবাদ হোটেল।

আমিও তাই। ...এদিকে কী? বেড়াতে?

হ্যাঁ, সেইরকমই। আপনি?

আমি এলোরা নিয়ে একটা বই লিখছি। আগে আরেকবার গেছি, এটা দ্বিতীয়বার। ইন্ডিয়ান আর্ট হিস্ট্রি পড়াই মিশিগানে।

ছাত্রদের উৎসাহ আছে?

আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজকাল তো ইন্ডিয়ার দিকেই চেয়ে আছে ওরা। বিশেষত ইয়াং জেনারেশন।

বৈষ্ণব ধর্মের খুব প্রভাব শোনা যাচ্ছে? ফেলুদা একটু ঠাট্টার সুরেই প্রশ্নটা করেছিল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, হরেকৃষ্ণর কথা বলছেন তো? জানি। তবে ওরা কিন্তু খুব সিরিয়াস। মাথা মুড়িয়ে ফোঁটা কেটে ধূতির কোঁচটা দুলিয়ে কেমন খোল করতাল বাজায় দেখেছেন তো? চোখে না দেখে দূর থেকে শুনলে খাঁটি কীর্তনের দল বলে ভুল হবে...

এয়ারলাইনস আপিসের পাশেই আওরঙ্গাবাদ হাটেল, পৌঁছতে লাগল। মাত্র পনেরো মিনিট। ছোট হাটেল, তবে থাকার ব্যবস্থা বেশ ভাল। খাতায় নামষ্টাম লিখিয়ে আমরা দুজন গেলাম। এগারো নম্বর ঘরে, লালমোহনবাবু চোদ্দেয়। ফেলুদা স্যান্টাক্রুজ থেকে একটা বম্বের কাগজ কিনেছিল, রেস্টোরান্টে খাবার সময় ওটা পড়তে দেখেছিলাম। এবার ঘরে এসে চেয়ারে বসে মাঝখানকার একটা পাতায় কাগজটা খুলে আমায় জিজ্ঞেস করল, ভ্যান্ডালিজম মানে জানিস? পরিষ্কার না জানলেও, আবছা আবছা জানতাম। গুণ্ডামি ধরনের কোনও ব্যাপার কি? ফেলুদা বলল, পঞ্চম শতাব্দীতে যে বর্বর জাতি রোম শহরকে ধ্বংস করেছিল তাদের বলত ভ্যান্ডালস। সেই থেকে ভ্যান্ডালিজম বলতে বোঝায় কোনও সুন্দর জিনিসকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা। ,

কথাটা বলে ফেলুদা কাগজটা আমার হাতে দিল। তাতে খবর রয়েছে—মোর ভ্যান্ডালিজম। তার নীচে বলছে-মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহাতে ত্রিংশ শতাব্দীর কান্ডারিয়া মেহাদেও মন্দিরের গা থেকে একটা মেয়ের মূর্তির মাথা কে বা কারা যেন ভেঙে নিয়ে গেছে। বরোদার এক আর্ট স্কুলের চারজন ছাত্র মন্দিরটা দেখতে গিয়েছিল, তারাই নাকি প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করে। গত এক মাসে এই নিয়ে নাকি তিনবার এই ধরনের ভ্যান্ডালিজমের খবর জানা গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই মূর্তির টুকরোগুলোকে নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে।

আমি খবরটা হজম করার চেষ্টা করছি এমন সময় ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, যদ্দূর মনে হয়-অক্টোপাস একটাই। তার শুড়গুলো ভারতবর্ষের এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে এ-মন্দির ও-মন্দির থেকে মূর্তি

সরাচ্ছে। যে-কোনও একটা গুঁড়কে জখম করতে পারলেই সমস্ত শরীরটা ধড়ফড় করে উঠবে। এই জখম করাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

০৫. আওরঙ্গাবাদ ঐতিহাসিক শহর

আওরঙ্গাবাদ ঐতিহাসিক শহর। আবিসিনিয়ার এক ক্রীতদাস-নাম মালিক অম্বর–ভারতবর্ষে এসে তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে ক্রমে আমেদনগরের রাজার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। তিনিই খাড়কে নামে একটা শহরের পত্তন করেন, যেটা আওরঙ্গজেবের আমলে নাম পালটে হয়ে যায় আওরঙ্গবাদ। মোগল আমলের চিহ্ন ছাড়াও এখানে রয়েছে প্রায় তেরোশো বছরের পুরনো আট-দশটা বৌদ্ধ গুহা-যার ভেতরে দেখবার মতো কিছু মূর্তি রয়েছে। যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আজ আলাপ হল, তিনি বিকেলে আমাদের সঙ্গে আরেকটু বেশি ভাব জমাতে আমাদের ঘরে এসেছিলেন। একসঙ্গে চা খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন, এই সব গুহার মূর্তির সঙ্গে নাকি এলোরার মূর্তির খানিকটা মিল আছে।আপনারা কাল যদি সময় পান একবার দেখে আসবেন। আজ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে; কাল সকালে দিন ভাল থাকলে আমরা সেই গুহাগুলো, আর তার কাছেই আওরঙ্গজেবের রানির স্মৃতিস্তম্ভ বিবি-কা-মাকবার দেখে আসব। আমাদের কাল দুপুরটা পর্যন্ত থাকতেই হবে, কারণ এগারেটার সময় জয়ন্ত মল্লিকের আসার কথা। আমাদের বিশ্বাস তিনি এলোরা যাবেন, এবং আমরা যাব তাঁকে ফলো করে।

রাত্রে খাবার পর ফেলুদা তার এলোরার গাইডবুক নিয়ে বসল। আমি কী করি তাই ভাবছি, এমন সময় জটায়ু এসে বললেন, কী করছ, তপেশীবাবু? বাইরে বেশ চাঁদ উঠেছে, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

হাটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধ হয় বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে ট্রানজিসটারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। রাস্তার উলটো দিকে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা উচিয়ে তর্ক করছে—কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ ভাষাটা বোধ হয় মারাঠি। দিনের বেলায় রাস্তাটায় বেশ লোকজন গাড়িটাড়ির চলাচল ছিল, এখন এই দশটার মধ্যেই সব কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল, একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোত্থেকে জানি একটা লোক এ মধুকর-এ মধুকর বলে চেঁচিয়ে উঠল—সবই যেন কেমন নতুন নতুন, সব কিছুর মধ্যেই যেন খানিকট রহস্য, খানিকটা রোমাঞ্চ, খানিকটা অজানা ভয় মেশানো রয়েছে। আর তার মধ্যে লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, শুভঙ্কর বোসকে দেখে একটু সাস্‌পিশাস্‌ বলে মনে হচ্ছে না তোমার?

বলতে ভুলে গেছি। ওই বাঙালি প্রফেসরটির নাম হল শুভঙ্কর বাস। আমি বললাম, কেন?

ওর সুটকেসের মধ্যে কী আছে বলো তো? পঁয়ত্রিশ কিলো ওজন হয় কী করে?

পঁয়ত্রিশ কিলো!-আমি তো অবাক।

বম্বেতে প্লেনে ওঠার আগে মাল ওজন করছিল। আমার সামনেই উনি ছিলেন। আমি দেখেছি। পয়ত্রিশ কিলো! যেখানে তোমার দাদারটা বাইশ, তোমারটা চোদ্দো, আমারটা ষোলো। ভদ্রলোককে অতিরিক্ত মালের জন্য বেশ কিছু টাকা দিতে হল।

এ খবরটা আমি জানতাম না। অথচ বাক্সটা বেশি বড় নয় ঠিকই। কী আছে ওটার মধ্যে?

পাথর লালমোহনবাবু নিজেই ফিসফিস করে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। -কিংবা পাথর ভাঙার জন্য লোহার সব যন্ত্রপাতি; তোমার দাদা বলছিলেন। না-এইসব মূর্তি চুরির পেছনে একটা দল আছে? আমি বলছি উনি সেই দলের একজন। ওর নাকটা দেখেছি? ঠিক ঘনশ্যাম কর্কটের মতো।

ঘনশ্যাম কর্কট? সে আবার কে?

ও হা—তোমাকে বলা হয়নি। আমার নতুন গল্পের ভিলেন। তার নাকের বর্ণনা কীরকম দেব জান তো? পাশ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন জলের উপর বেরিয়ে থাকা হাঙরের ডানা!

জটায়ু আমার মাথাটা গণ্ডগোল করে দিলেন। আমার কিন্তু শুভঙ্কর বোসকে একটুও সন্দেহ হয়নি। কারণ যে লোক আর্ট সম্বন্ধে এত জানেন...। অবিশ্যি এখন ভাবলে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের নাম-করা মন্দিরগুলো থেকে যারা মূর্তি চুরি করবে তাদেরও তো আর্ট সম্বন্ধে কিছুটা জানতেই হবে। ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে সত্যিই একটা ধারালো ভাব আছে।

তোমায় বলে দিলুম, লালমোহনবাবু বললেন, এবার থেকে খালি একটু চোখে চাখে রেখা। আমাকে আজকে একটা ল্যাবেঞ্চুস অফার করেচিলেন, নিলুম না। যদি বিষ-টিষ মেশানো থাকে! তোমার দাদাকে বোলো ওঁর নিজের পরিচয়টা যেন গোপন রাখেন। উনি

রাত্রে ফেলুদাকে শুভঙ্কর বোসের বাক্সের ওজনের কথাটা বলতে ও বলল, পিয়ত্রিশ নয়, সাঁইত্রিশ কিলো। জটায়ুকে বলে দিস যে শুধু পাথরেরই ওজন হয় না, বইয়েরও হয়। আমার বিশ্বাস লোকটা পড়াশুনো করার জন্য সঙ্গে অনেক বই এনেছে।

পরদিন সকালে সাড়ে ছটায় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এখানকায় নকল তাজমহল বিবি-কা-মোক্কারা দেখে তারপর বৌদ্ধ গুহা দেখতে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে তারপর গুহায় পৌঁছানো যায়। আমাদের সঙ্গে শুভঙ্কর বোসও রয়েছেন, সমানে আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে চলেছেন, তার অর্ধেক কথা আমার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাকি কথা কোনও কানেই ঢুকছে না। লোকটাকে অনেক চেষ্টা করেও চোর-বদমাইস হিসাবে ভাবতে পারছি না, যদিও লালমোহনবাবু বার বার আড়াচোখে তাকে দেখছেন, আর তার ফলে সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছেন।

আমরা ছাড়া আরও দুজন লোক আমাদের আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছেন। তার মধ্যে একজন রংচঙে হাইওয়ান শার্ট পরা এক টেকো সাহেব, আর আরেকজন নিশ্চয়ই টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের মাইনে করা গাইড।

ফেলুদা তার নকশা করা ঝোলাটা থেকে তার পেনট্যাক্স ক্যামেরাটা বার করে মাঝে মাঝে ছবি তুলছে, কখনও পাহাড়ের উপর থেকে শহরের ছবি, কখনও বা আমাদের ছবি। আমাদের দিকে ক্যামেরা তাগ করলেই লালমোহনবাবু থেমে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে পোজ দিচ্ছেন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে হাঁটা অবস্থাতেও ছবি ওঠে, আর না-হাসলে অনেক সময় ছবি আরও বেশি ভাল ওঠে।

গুহার মুখে পৌঁছে ফেলুদা বলল, তোরা দ্যাখ আমি কটা ছবি তুলে আসছি। শুভঙ্করবাবু বললেন, দু নম্বর আর সাত নম্বরটা মিস করবেন না। এক থেকে পাঁচ এই কাছাকাছির মধ্যেই পাবেন, আর ছয় থেকে নয় হল এখান থেকে হাফ-এ-মাইল পুব দিকে। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্ত পাবেন।

একে জুন মাস, তার উপর ঝলমলে রোদ, তাই বাইরেটা বেশ গরম লাগছিল। কিন্তু গুহার ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ ঠাণ্ডা। এক নম্বরটায় বিশেষ কিছু নেই, আর দেখেই বোঝা যায় সেটার কাজ অর্ধেক করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর যেটুকু তৈরি ছিল তারও খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে। শুভঙ্করবাবু তাও ভারী আগ্রহের সঙ্গে বারান্দার থাম, সিলিং ইত্যাদি দেখে খাতায় কী সব নোট করে নিতে লাগলেন। আমি আর লালমোহনবাবু দু নম্বর গুহায় গিয়ে ঢুকলাম! ফেলুদা আমার সঙ্গে একটা টর্চ দিয়ে দিয়েছিল, বারান্দা পেরিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে টর্চটা জ্বালতে হল। বেশ বড় একটা হল ঘর, তার শেষ মাথায় একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি। দু পাশের দেয়ালে টর্চ ফেলে দেখি সেগুলোতেও চমৎকার সব মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন, তখনকার আর্টিস্টদের শুধু আর্টিস্ট হলে

চলন্ত না, বুঝলে হে তপেশ, সেই সঙ্গে গায়ের জোরও থাকতে হত। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে পাহাড়ের গায়ের পাথর ভেঙে তৈরি করতে হয়েছে। এ সব মূর্তি-চাট্টিখানি কথা নয়।

তিন নম্বরের ভিতরে ঢুকে দেখি আরও বড় একটা হল ঘর, আর সে ঘর সেই গাইডের বকবকানিতে এমন গম গম করছে যে সেখানে টেকা দেয়। বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, তোমার দাদা গেলেন কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

সত্যিই তো। ফেলুদা কোথায় গিয়ে ছবি তুলছে?

আর শুভঙ্করবাবুই বা কোথায়?

চলো, এগিয়ে চলো, বললেন লালমোহনবাবু।

পাশেই পর পর চার আর পাঁচ নম্বর গুহা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা না থাকায় কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে। কাছাকাছির মধ্যে কোথাও নেই। আন্দাজ করে আমরা পুব দিকের গুহাগুলোর পথ ধরলাম; প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হবে, কিন্তু যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার চেয়ে পাথর আর ঝোপঝাড়ই বেশি। ঘড়িতে মাত্র সোয়া আটটা, তাই রোদের তেজ এখনও তেমন বেশি নয়। দশটার বেশি দেরি করা চলবে না, কারণ এগারোটার গাড়িতে জয়ন্ত মল্লিক আসবেন।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর রাস্তা থেকে কিছুটা উপর দিকে একটা গুহা দেখতে পেলাম। এটা বাধ হয়। ছ নম্বর। পথে ফেলুদার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। লালমোহনবাবু গোয়েন্দার ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ঝুকে পড়ে পায়ের ছাপ খোঁজার বৃথা চেষ্টা করছেন। এ ধরনের পাহাড়ে পথে এমনিতেই বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, তার উপরে সকাল থেকে একটানা দুঘণ্টা রোদ হয়ে রয়েছে। রাস্তা একেবারে শুকনো খটখাটে।

আর এগোনের কোনও মানে আছে কি? তার চেয়ে ওর নাম ধরে ডাকলে কেমন হয়?

ফেলুদা! ফেলুদা।

প্রদোষবাবু! ফেলুবাবু~~~! ও মিস্টার মিত্তি-র !

কোনও উত্তর নেই। আমার পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ওপর দিকে কোথাও চলে গেল নাকি? কোনও কিছুর সন্ধান পেয়েছে কি? জরুরি কিছু?—যার ফলে আমাদের কথা ভুলে গিয়ে তদন্তের কাজে লেগে যেতে হয়েছে?

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, এদিকে নেই। থাকলে ডাক শুনতে পেতেন। নিশ্চয় ওদিকেই আছেন। চলো ফিরে চলো। এবার দেখা পাব নিঘাত। তোমার দাদা তো আর খামখেয়ালি নন, বা কাঁচা কাজ করার লোক নন। চলো।

আমরা উলটোমুখে ঘুরলাম। কিছু দূর গিয়েই সেই সাহেব আর তার গাইডের সঙ্গে দেখা হল। এরা এক থেকে পাঁচ শেষ করে ছায়ের দিকে চলেছে। বেশ বুঝলাম গাইডের কথার ঠেলায় সাহেবের অবস্থা কাহিল।

ওই তো শুভঙ্করবাবু! লালমোহনবাবু বলে উঠলেন। ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। জটায়ুর গলা শুনে মুখ তুললেন। আমি ব্যস্তভাবে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার দাদাকে দেখেছেন কি?

কই না তো। উনি যে বললেন ছবি তুলতে যাবেন?

কিন্তু ওকে তো দেখছি না। আপনি গুহাগুলো...?

কেভের মধ্যে নেই। আমি সবগুলো দেখে আসছি।

আমার ভয় ভয় ভাব দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক সত্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, কোথায় আর যাবেন- পাহাড়ের ওপর দিকে কোথাও গেছেন হয়তো। শহরটার একটা ভাল ভিউ পাওয়া যায় ওপর থেকে। একটু এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাক দাও-ঠিক শুনতে পাবেন।

শুভঙ্কর বোস ছ নম্বর কেভের দিকে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বললেন, গীতিক ভাল লাগছে না তপেশ। এলোরা না যেতেই একটা চিন্তার কারণ ঘটবে এটা ভাবিনি।

মনে সাহস আনার চেষ্টা করে এগিয়ে চললাম! হাঁটার স্পিড আপনা থেকেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে সময়ের ভীষণ দাম, এগারোটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, মল্লিক এল কি না জানতে হবে। অথচ ফেলুদাই বেপাত্তা। ফেলুদা ছাড়া...ফেলুদা ছাড়া....

চারমিনার–লালমোহনবাবুর হঠাৎ চিৎকারে চমকে লাফিয়ে উঠলাম।

সামনেই পাঁচ নম্বর গুহার থামগুলো দেখা যাচ্ছে। তার বাইরে একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে একটা হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। যাবার সময় সেটা হয় ছিল না, না হয় চোখে পড়েনি। খালি প্যাকেট কি? নাকি সিগারেট থাকা অবস্থায় পকেট থেকে পড়ে গেছে? কিংবা হাত থেকে?...

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে তুললাম। খুলে দেখি খালি। ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি দেখি বলে। লালমোহনবাবু সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরও বেশি করে খুলতেই ভিতরের সাদা কাগজের গায়ে একটা ডট পেনের লেখা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদার হাতের লেখা—

হোটেলে ফিরে যা।

যদিও ফেলুদার একটা চিহ্ন পেয়ে হাঁপ ছাড়ার একটা কারণ হল, কিন্তু কী কারণে কী অবস্থায় সেটা লিখতে হয়েছে না জেনে পেটের ভিতরে খালি ভাবটা পুরোপুরি গেল না। লালমোহনবাবু বললেন, তা না হয় হোটেলে ফিরে গেলুম, কিন্তু মিস্টার বোসের কী হবে? তাঁর তো আরও চারটে গুহা দেখতে বাকি।

আমি বললাম, এক কাজ করি।–আমরা ফিরে গিয়ে ট্যাক্সিটা ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই।

এখানে থেকে ওঁর গতিবিধি একটু লক্ষ করলে হত না?

মিস্টার বোসের?

হ্যাঁ।

আমার কিন্তু মনে হয় ফেলুদার আদেশ মানা উচিত।

তবে চলে যাই হোটেলে ফিরে।

লালমোহনবাবু নিজে রহস্যের গল্প লেখেন বলেই বোধহয় মাঝে মাঝে ওঁর গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক চাপে। বেশ বুঝতে পারছিলাম উনি শুভঙ্করবাবুকে ফলো করতে চাচ্ছেন, কিন্তু বাধ্য হয়েই বাধা দিতে হল। ট্যাক্সি আমাদের দুজনকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আবার গুহায় ফিরে গেল! এখন মাত্র নটা। এইভাবে ফেলুদার অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না।

ঘরে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই দুজনে হাটেলের বাইরে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম। সকলে আকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন আবার মেঘ করে আসছে। এক হিসেবে ভাল। গরমটা কমবে।

পৌনে দশটা নাগাদ শুভঙ্করবাবু ফিরে এসে ফেলুদা তখনও আসেনি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন। অথচ আমরা যে একটা ক্রাইমের তদন্ত করতে এসেছি, বিপদের আশঙ্কা আছে, এটাও ওঁকে বলা যায় না, কারণ এখনও সেরকম আলাপ হয়নি, আর লালমোহনবাবুর এখনও বিশ্বাস উনি শত্রুপক্ষের লোক। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এটা বোঝানোর জন্য বললাম, ও ওইরকমই লোক। ভীষণ ভুলো আর খামখেয়ালি। আগেও অনেক বার এরকম করেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় পায়চারি করে ঘরে ফিরে এসে টিনটিনের বইটা খুলে তুষার মানবের রোমাঞ্চকর ঘটনায় মন দিতে চেষ্টা করলাম। এগারেটার কিছু পরে একবার মুনে হল যেন একটা ট্রেনের হুইসলা শুনতে পেলাম। পৌনে বারোটার সময় বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। গিয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি থেকে দুজন ভদ্রলোক নামলেন। একজন মাঝারি হাইট, কাঁধ চওড়া, ঘাড়ে-গদর্শনে চেহারা, দেখেই কেন জানি মনে হয় কড়া সাহেবি মেজাজের লোক। অন্যজন লম্বা, বেলবটম প্যান্ট, ফুলকারি করা পাতলা শার্ট, গলায় চেন, লম্বা চুল, এলোমেলো গোঁফ দাড়ি। এরা দুজন ট্যাক্সি শেয়ার করে এসেছেন, এক জোটে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। লম্বার সঙ্গে একটা নতুন ক্যানভাসের ব্যাগ, আর ঘাড়ে-গদানের সঙ্গে পুরনো চামড়ার সুটকেস। মাল নিয়ে দুজনে হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ট্যাক্সি এসে পড়ল।

দরজা খুলে নামলেন জয়ন্ত মল্লিক।

তাকে দেখে যতটা নিশ্চিন্ত হলাম, তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ফেলুদার কাণ্ড দেখে।

এরকম অবস্থায় কি এর আগে পড়েছি কখনও? মনে তো পড়ে না।

০৬. ফেলুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

আরও দশ মিনিট ফেলুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় অগত্যা হোটেলে ফিরে গিয়ে লালমোহনবাবুর ঘরের দরজায় টোকা মারলাম। উনি দরজা খুলেই চোখ গোল করে বললেন, আমি এতক্ষণ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দারুণ সাসপিশাস্ সব লোকেরা এসে পড়েছে। এরা সবাই কি এলোরা যাবে নাকি? একটা তো একেবারে হিপি না হিপো না কী বলে ঠিক সেইরকম; নিঘতি গাঁজ-টাজ খায়। লম্বা চুল, এলোপাথাড়ি দাড়ি গোঁফ।

আমি জানি লালমোহনবাবু কার কথা বলছেন। আমি বললাম, মিস্টার মল্লিকও এসে (2igছন্।

বটে? কীরকম দেখতে বলে তো?

আমি বর্ণনা দিতেই ভদ্রলোক বললেন, লোকটা আমার পাশের ঘরে রয়েছে। আমি দেখেই ডাউট করেছিলুম, কারণ ওর সুটকেসটা বইতে হাটেলের বেয়ারার কাঁধ বেঁকে গেল। ওর মধ্যেই তো যক্ষীর মাথাটা রয়েছে?

আমি ফেলুদার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না, তাই বললাম, যক্ষীর মাথার চেয়েও দরকার ফেলুদার সন্ধান পাওয়া। এলোরায় যাবার কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি। অথচ মল্লিক, নিশ্চয়ই বসে থাকার জন্য আসেনি। আমরা যাবার আগে সে যদি গিয়ে আরেকটা মূর্তি টুর্তি ভেঙে–

ওটা কী?

লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্নটা করে আমার কথা থামিয়ে দিলেন। তিনি চেয়ে আছেন দরজার দিকে। আমি ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি তার তলা দিয়ে কে যেন একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এক লাফে গিয়ে কাগজটা তুলে ভাঁজ খুললাম। তিন লাইনের চিঠি। ফেলুদার হাতের লেখা—

দেড়টার সময় সব মাল নিয়ে দুজনে হোটের বাইরে গিয়ে পাঁচশো ত্রিশ নম্বর কালো অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করবি। লাঞ্চ সোরে নিস। হোটেলের ভাড়া অ্যাডভান্স দেওয়া আছে।

চিঠিটা পড়েই দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই পাশের ঘর থেকে মল্লিক বেরিয়ো ব্যস্তভাবে আপিসের দিকে চলে গেল। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, কিন্তু মনে হল না যে ভদ্রলোক চিনতে পেরেছেন।

ঘর খালি। দরজা খোলা; একবার যাব নাকি! যক্ষীয় মাথাটা যদি...

লালমোহনবাবুর সাহস বড় বেড়ে গেছে। বললাম, একটা বাজে। আমার মনে হয় আপনার তৈরি হয়ে নেওয়া উচিত। আমিও যাই।

একটা পঁচিশে লাঞ্চ সেরে ফেলুদার সুটকেস সমেত আমাদের মাল নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লালমোহনবাবু এই ফাঁকে রাস্তার উলটো দিকের একটা দোকান থেকে পান। কিনে আনলেন। মিঠে পান পাওয়া যায় না; এ হল সাদা মগাই পান। কলকাতায় কক্ষনও খাই না, কিন্তু এখানে দিব্যি লাগছে।

একটা ট্যাক্সি এল। কালো নয়, সবুজ। নম্বরও মিলছে না। ড্রাইভারটা বাইরে বেরিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড় ভাঙল।

তিন মিনিট পরে আরেকটা ট্যাক্সি। কালো অ্যাম্বাসাডর। নম্বর পাঁচশো ত্রিশ। আমরা দুজনে মাল নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

মিস্টার মিটারকা পার্টি? পাঞ্জাবি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ হ্যাঁ। জটায়ু বেশ ভারিক্কি চালে হিন্দি মেজাজে উত্তর দিলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনটা খুলে দিল, সুটকেস তিনটে ভিতরে চলে গেল।

হাটেল থেকে লোক বেরোচ্ছে। মিস্টার মল্লিক। আর শুভঙ্কর বোস। এদের একটু আগেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেতে দেখেছি। সবুজ ট্যাক্সিতে উঠলেন দুজন। ট্যাক্সিটা দুবার গোঁ গোঁ করে স্টার্ট নিয়ে আদালত রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিল। এলোরা যেতে হলে ওই দিকেই যেতে হয়।

সাসপেন্সে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে ফেলুদার উপর যে একটু রাগও হচ্ছিল না তা নয়। অথচ মন বলছে ফেলুদা খামখেয়ালি লোক নয়, যা করে তা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করে করে।

অ্যাবার লোক। এবার সেই দিশি হিপি, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ। সোজা আমার দিকে এসে চাপা গলায় বলল, উঠে পড়।

কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম প্রায় ম্যাজিকের মত আমি গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছি, সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে হিপি তাকেও গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল, আর নিজে এসে আমার পাশে ধাপ করে বসে দরজাটা এক টানে বন্ধ করে বলল, চলিয়ে দীনদয়ালজি।

ফেলুদা ভাল মেক আপ করতে পারে জানি, কিন্তু এমন আশ্চর্য রকম ভাল পারে, গলার স্বর হাঁটা চলা চোখের চাহনি–সব কিছু এমনভাবে পালটাতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি এর মধ্যেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন। চমক লাগার ফলে বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনাটাও জানতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ফেলুদা মুখ খুলল একেবারে শহর ছাড়িয়ে খোলা রাস্তায় পড়ে।

সেই বারাসতের কারখানায় মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; ও যদি দেখত সেই একই লোক তার সঙ্গে এলোরা যাচ্ছে তা হলে গণ্ডগোল হয়ে যেত। তাই এই মেকআপ। তোদের বলিনি, কারণ তোরা দেখে চিনতে পারিস কি না সেটা জানা দরকার ছিল। পারলি না, কাজেই নিশ্চিন্ত হলাম।

ঝোলার মধ্যে সব ছিল; ছবি তোলার নাম করে ছ নম্বর কেভে চলে যাই। ওটা একটু ওপর দিকে বলে বিশেষ কেউ যায় না। মেক-আপ হলে পর সেই অবস্থায় হেঁটে শহরে ফিরে আসি। প্রথমে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করি, তারপর স্টেশনে গিয়ে মনমডের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করি। মল্লিককে নামতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে ফলো করে ওর পিছনের ট্যাক্সিটায় উঠি। আরেকজন আসছিল হোটেলে, তাকে সঙ্গে তুলে নিই ভাড়াটা শেয়ার করতে পারব বলে। ... শুভঙ্কর বোস জিজ্ঞেস করলে বলিস দাদা একটা বিশেষ কাজে বম্বে চলে গেছে, কারণ এই মেক-আপ কেবল রাত্রে শোবার আগে ছাড়া খোলা যাবে না। তোতে আমাতে আলাপ আছে এটা জানলেও মুশকিল। তুই আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে এসেছিস, আমি আলাদা! তোরা এক ঘরে থাকবি, আমি আলাদা ঘরে।

তুমি বাঙালি তো?—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ফেলুদার সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলতে হবে ভাবতে ভাল লাগছিল না।

বাংলা জানি এটুকু বলে রাখছি। নাম জানার দরকার নেই; পেশা ফটোগ্রাফি; হংকং-এর এশিয়া ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তুলতে এসেছি।

আর আমরা?

মামা-ভাগনে। উনি সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তুই সিটি স্কুলের ছাত্র। ছবি আঁকার শখ আছে। সামনের বছর কলেজে ঢুকবি। ইতিহাসে অনার্স নিবি। তোর পদবি মুখার্জি। লালমোহনবাবুর নাম চেঞ্জ হচ্ছে না। আপনি এলোরা সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে নেবেন। মোটামুটি মনে রাখবেন যে, কৈলাসের মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকুট রাজবংশের রাজা কৃষ্ণের আমলে।

লালমোহনবাবু কথাটা বিড়বিড় করে আওড়ে নিয়ে চলন্ত গাড়িতেই কোনওমতে তাঁর খাতায় নোট করে নিলেন। ভীষণ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ফেলুদা আমাদের উপর। এখন বুঝতে পারছি ফেলুদা কোন নিজে গরজ করে লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নিতে চাইছিল। ও জানত যে মল্লিকের সন্দেহ এড়াবার জন্য ওকে ছদ্মবেশ নিতে হবে, আমার থেকে আলাদা থাকতে হবে। লালমোহনবাবু থাকলে দলটা ভারীও হবে, আর আমার একজন অভিভাবকও হবে। লালমোহনবাবুকে মামা বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফেলুদাকে ভাল করে চিনি না—এটা বোঝাতে গেলে সত্যিই অ্যাকটিং করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী?

আওরঙ্গাবাদ থেকে এলোরার রাস্তা চমৎকার; দূরে পাহাড়-যদিও বেশি উঁচু না-আর রাস্তার দু পাশে রুক্ষ জমি। একটা নতুন ধরনের মনসার ঝোপ দেখতে পাচ্ছি। যেটা ফণীমনসা নয়। রাজস্থানেও এরকম লম্বা লম্বা মনসার পাতা দেখেছি। এর এক একটা ঝোপ প্রায় দেড় মানুষ উঁচু।

পিছনে কিছুক্ষণ থেকেই একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল, আমাদের ড্রাইভার সিগন্যাল করাতে সেটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তাতে রয়েছে সেই টেকো সাহেব, আর ফেলুদার সঙ্গে যে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল সেই ঘাড়ে-গদর্শনে লোকটা।

আধা ঘণ্টার মধ্যেই একটা পাহাড় ক্রমে কাছে এগিয়ে এল। রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁষে খানিকটা উপর দিকে উঠে, ডান দিকে পাহাড়টাকে রেখে এগোতে লাগল। বাঁ দিকে দূরে একটা ছোট্ট শহরের মতো দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার বলল সেটা খুলদাবাদ, আর খুলদাবাদেই নাকি এলোরার গুহা। আমরা ডাক বাংলোতে থাকব। অন্য সময় হলে হয়তো এত চট করে। জায়গা পাওয়া যেত না, কিন্তু আগেই বলেছি। এটা অফ-সিজন; তার মানে টুরিস্টদের সংখ্যা কম। আর সেই কারণেই অবিশ্যি মূর্তি-চোরদেরও সুবিধে।

আরও খানিকটা যেতেই ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে প্রথম গুহাগুলো দেখতে পেলাম। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, পহিলে কেভ দেখনা, ইয়া বাংলোমে যানা?

ফেলুদা বলল, পহিলে বাংলো।

বাঁ দিক দিয়ে একটা রাস্তা খুলদাবাদের দিকে চলে গেছে। গাড়ি সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেল। আমি তখনও অবাক হয়ে পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা সারি সারি গুহাগুলোর দিকে দেখছি। এর মধ্যে কৈলাস কোনটা কে জানে।

খুলদাবাদে দুটো থাকার জায়গা আছে—একটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস—সেটা ভাড়া বেশি—আর একটা ডাক বাংলো। আমরা বাংলোতেই দুটো ঘর বুক করেছি। যাবার পথে আগে গেস্ট হাউসটা পড়ে। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সামনের বাগানের পাশে সবুজ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে? তার মানে জয়ন্ত মল্লিক এটাতেই উঠেছেন। গেস্ট হাউসের পরের বাড়িটাই বাংলো, দুটোর মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা। সাইজে বাংলোটা অনেক ছোট, বাহারও কম, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফেলুদা ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বলল সে যেন মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে। আমরা জিনিসপত্র রেখে কৈলাসে যাব, ও আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ ফিরে যাবে।

ডাক ব্যাংলোয় সবসুদ্ধ চারটি ঘর, প্রত্যেকটায় তিনটে করে খাট। ফেলুদা ইচ্ছে করলে আমাদের ঘরে থাকতে পারত, কিন্তু থাকলে না; ও নিজের ঘরে যাবার সময় চাপা গলায় বলে গেল, তোর পদবি মুখার্জি, লালমোহনবাবু তোর মেজোমামা, রাষ্ট্রকুট, সেভেনথ সেঞ্চুরি, রাজার নাম কৃষ্ণ...আমি দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।

আমাদের ছেড়ে ফেলুদা তার নিজের ঘরে গিয়েই চৌকিদার বলে হাঁক দিল। এমন একটা গলায় যার সঙ্গে ওরা নিজের গলার কোনও মিল নেই।

আমরা দুজনে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝখানের ডাইনিং রুমটায় এসে বুঝতে পারলাম যে আরেকজন লোক বাংলোয় এসে উঠেছেন। ইনিই ফেলুদার সঙ্গে স্টেশন থেকে এসেছিলেন, আর একেই আমরা একটু আগে ট্যাক্সিতে সেই সাহেবটার সঙ্গে দেখেছি। তখন দেখে বক্সার বা কুস্তিগির বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি চোখের কোণে একটা বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল হাসি হাসি ভাব রয়েছে, যাতে মনে হয়। ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া জানেন-এমনকী হয়তো কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী-টিল্পীও হতে পারেন। আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, বেঙ্গলি?

ইয়েস স্যার, লালমোহনবাবু জবাব দিলেন। —ফ্রম ক্যালকাটা। আই অ্যাম দি কী বলে প্রোফেসার অফ হিস্ট্রি ইন দি সিটি কলেজ। অ্যান্ড দিস ইজ কী বলে মাই নেফিউ।

কৈলাস দেখতে আসা হয়েছে?–পরিষ্কার বাংলায় বললেন ভদ্রলোক।

হা হা-আপনিও বাঙালি?

একশো বার। তবে কলকাতার নয়। এলাহাবাদের।

ভদ্রলোকের বাংলায় একটা টান আছে। যেটা অনেক প্রবাসী বাঙালির মধ্যেই থাকে। আমাদের আর কিছু না বললেও চলত, কিন্তু ইংরিজি বলতে হবে না জেনে বোধ হয় খুশি হয়েই লালমোহনবাবু আরও একগাদা কথা বলে ফেললেন।

ভাবলুম রাষ্ট্রপুট বংশের অতুল কীর্তিটা একবার দেখে আসি, হেঁ হেঁ। আমার ভাগ্নেটির আবার আর্টের দিকে খুব ইয়ে। বলছে বি এ পড়ে আর্ট কলেজে ঢুকবে। দিব্যি ছবি আঁকে। ভূতো, তোমার ড্রইং-এর খাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে নিয়ো!

আমি চুপ করে রইলাম, কারণ ড্রইং-এর খাতা আমি আনিনি।

ফেলুদাও এই ফাঁকে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ক্যামেরাটা বাইরে বের করে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে, কারণ ছবি তাকে তুলতেই হবে। আমাদের তিনজনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে তার নতুন গলায় নতুন উচ্চারণে বলল, আপনাদের যদি কেভ দেখার ইচ্ছে থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে পারেন। ট্যাক্সিটা এখনও রয়েছে।

বাঃ-খুব সুবিধেই হল! লালমোহনবাবু বললেন। —আপনি যাবেন নাকি ওদিকে?

প্রশ্নটা করা হল এলাহাবাদের বাবুটিকে। বাবু বললেন, আমি পরে যাব। আই মাস্ট হ্যাভ এ বাথ ফার্স্ট।

বাইরে এসেই লালমোহনবাবু শুকনা গলায় বললেন, আরও কিছু ছাড়ুন মশাই। ইতিহাসের স্টকটা আরেকটু না বাড়ালে চলছে না।

ফেলুদা বলল, ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পিরিয়ডগুলোর নাম জানা আছে আপনার?

তার মানে? এই যেমন মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, কুষাণ, চোল—বা এদিকে পাল বংশ, সেন বংশ-এগুলো জানেন?

লালমোহনবাবুর, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল! ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, একটা কথা বলব মশাই?–এমনও তো হতে পারে যে আমি কানে খাটো। কেউ কথা বললে যদি ঠিকমতো না শোনার ভান করি তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

আপত্তি নেই—যদি অভিনয়টা ঠিক হয়, আর যদি সেটা মেনটেন করে যেতে পারেন।

সেটা মশাই ইতিহাস-আওড়ানোর চেয়ে ঢের সহজ। দেখলেন তো কুট বলতে পুট বেরিয়ে গেল।

গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম জয়ন্ত মল্লিক বাইরে বেরিয়ে এসে পকেটে হাত দিয়ে বাংলোর দিকে চেয়ে আছে, আর সবুজ ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা যেন মল্লিককে দেখেই তার ঝোলাটায় হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট চিরুনি বার করে আমায় দিয়ে বলল, সিঁথিটা ডান দিকে করে নে তো; পোর্ট্রেন্টিন্ট একটু চেঞ্জ হবে। উইন্ডাস্ক্রিনের আয়নায় দেখে চুলটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলাম। শুধু সিঁথির এদিক ওদিকেই যে মানুষের চেহারা এতটা বদলে যায় সেটা আমার ধারণা ছিল না।

বাংলোয় যাবার রাস্তাটা যেখানে এসে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে খানিকটা গিয়েই সামনে বিখ্যাত কৈলাসের মন্দির। ফেলুদা বলেই দিয়েছিল যে আজ আর বেশি ঘোরা হবে না, কারণ কৈলাস দেখতে দেখতেই আলো পড়ে যাবে। ট্যাক্সি আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ চলে গেল।

কৈলাস যে কী ব্যাপার সেটা বাইরে থেকে তেমন বুঝতে পারিনি। সামনের প্রকাণ্ড পাথরের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই হঠাৎ যেন মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল। মূর্তিচোর, যক্ষীর মাথা, মিস্টার মল্লিক, শুভঙ্কর বোস-সব যেন ধোঁয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শুধু রইল একটা চোখ-ট্যারানো মন-ধাঁধানো অবাক হওয়ার ভাব। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, তেরোশো বছর আগে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে দক্ষিণাত্যের একদল কারিগর পাহাড়ের গা কেটে এই মন্দিরটা বার করেছে; কিন্তু পারলাম না। এ মন্দির যেন চিরকালই ছিল; কিংবা কোনও আদ্যিকালের জাদুকর কোনও আশ্চর্য মন্ত্রবলে এক সেকেন্ডে এটা তৈরি করেছে; কিংবা ফেলুদার সেই বইটাতে যেমন আছে—হয়তো মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানীগুণী কোনও প্রাণী অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে এটা তৈরি করে দিয়ে গেছে।

তিন দিকে পাহাড়ের দেয়ালের মাঝখানে কৈলাসের মন্দির। মন্দিরের এক পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে অন্য দিক দিয়ে আবার সামনে ফিরে আসা যায়। এই রাস্তা বা প্যাসেজ কোনওখানেই আট দশ হাতের বেশি চওড়া না। মন্দিরের ডাইনে আর বাঁয়ে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গুহার মতো ঘর করা আছে, আর তার মধ্যেও অনেক মূর্তি রয়েছে।

আমরা ডান দিকের প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, আর ফেলুদা বিড়বিড় করে ইনফরমেশন দিয়ে চলেছে—

জায়গাটা তিনশো ফুট লম্বা, দেড়শো ফুট চওড়া.মন্দিরের হাইট একশো ফুট.দু লক্ষ টন পাথর কেটে সরানো হয়েছিল.প্রথমে তিন দিকে পাথর কেটে খাদ তৈরি করে তারপর চূড়ো থেকে শুরু করে কাটিতে কাটতে নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছিল. দেব দেবী মানুষ জানোয়ার রামায়ণ মহাভারত কিছুই বাদ নেই। এখানে। ক্যালকুলেশনের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ..আর্ট ছেড়ে দিয়ে শুধু এঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকটা দ্যাখ...

ফেলুদা আরও বলত, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে থেমে আমাদের দুজনের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে গিয়ে একটা গহ্বরের মধ্যে রাবণের কৈলাস নাড়ার মূর্তিটা দেখতে লাগল।

পায়ের শব্দ। মন্দিরের পিছন থেকে শুভঙ্কর বোস বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা নাটবুক, কাঁধে একটা ঝোলা। ভারী মন দিয়ে মন্দিরের কারুকার্যগুলো দেখছেন তিনি। এবার মূর্তি ছেড়ে আমাদের দুজনের দিকে এল তাঁর দৃষ্টি। প্রথমে একটা হাসি, তারপরেই একটা উদ্বেগের ভাব।

তোমার দাদার কোনও খবর পেলে না? যতদূর পারি স্বাভাবিকভাবে বললাম, উনি একটা জরুরি কাজে হঠাৎ বম্বে চলে গেছেন। আজকালের মধ্যেই ফিরবেন।

ও...

শুভঙ্কর বোসের চোখ আবার পাথরের দিকে চলে গেল। পিছনে একটা খচা শব্দ পেয়ে বুঝলাম ফেলুদা একটা ছবি তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফেলুদা আবার আমাদের দিকে

পড়লাম। এবার আরেকজন লোককে দেখতে পেলাম। গায়ে নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট। মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক। ইনি সবেমাত্র এসে ঢুকেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদের দেখেই মন্দিরের দেয়ালে একটা হাতির মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। এর হাতের ব্যাগটা কলকাতাতেও দেখেছি। বারাসত থেকে ফেরার পথে এই ব্যাগ তার গাড়িতে ছিল, এই ব্যাগ নিয়ে উনি কুইনস ম্যানসনে নেমেছিলেন। ওটাতে কী আছে জানিবার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল হল। ফেলুদা আমাদের কাছাকাছি এসে গেছে। এক এক সময় ইচ্ছে করছিল ফেলুদা সোজা গিয়ে মল্লিকের কলারটা চেপে ধরে বলুক—কই, বার করুন মশাই যক্ষীর মাথা।—কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে ও ও-রকম কাঁচা কাজ করবে না। মল্লিক সিদিকপুরে গিয়েছিল সেটা ঠিক; এখন এলোরায় এসেছে সেটা ঠিক, আর বম্বেতে কাকে জানি ফোন

করে বলেছিল, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে—সেটাও ঠিক। কিন্তু এর বেশি কিছু ওর সম্বন্ধে এখনও জানা যায়নি। আরেকটু না জেনে, আরেকটু প্রমাণ না পেয়ে ফেলুদা কিছু করবে না।

যেটা এখনই করা যায় সেটা অবিশ্যি ফেলুদা করল। মল্লিকের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের শরীর দিয়ে ভদ্রলোকের ব্যাগটায় একটা ধাক্কা দিয়ে সরি বলে একটা মূর্তির দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফোকাস করতে লাগল।

ধাক্কা খেয়ে ব্যাগটা যেভাবে নড়বড় করে উঠল, তাতে মনে হল না তার ভিতরে কোনও ভারী জিনিস রয়েছে।

কৈলাস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোককে দেখতে পেলাম। একজন আমাদের বাংলোর এলাহাবাদি বাবু, আরেকজন হলেন সেই টেকে সাহেব! বাবু হাত নেড়ে কথা বলছেন, সাহেব মাথা নেড়ে শুনছেন। হঠাৎ কেন জানি মনে হল-আমরা তিনজন ছাড়া যত জন লোক এখানে এসেছে সবাই গোলামেলে, সবাইকেই সন্দেহ করা উচিত। ফেলুদাও কি তাই করছে?

০৭. কৈলাস থেকে ফেরার পথে

কৈলাস থেকে ফেরার পথে ফেলুদার হঠাৎ কেন জানি গেস্ট হাউসে যাবার ইচ্ছে হল। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, একবার খোঁজ করে আসি এখানে খবরের কাগজ আসে। কি না। আমরা বাংলোয় চলে গেলাম। আমাদের দুজনেরই খিদে পাচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবু চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে চা আর বিস্কুট অর্ডার দিলেন। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনিং রুম। তার ডান দিকের এক নম্বরের ঘরটা আমাদের। আমাদের পরের ঘরটা দু নম্বর, সেটা খালি। ডাইনিং রুমের উলটা দিকে আরও দুটো ঘর। তার মধ্যে আমাদের ঠিক উলটা দিকের ঘরটায় থাকেন এলাহাবাদি, আর তার পাশের চার নম্বরে ফেলুদা।

আগেই বলেছি, লালমোহনবাবুকে মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরিতে পেয়ে বসে। ওঁর এখন বোধ হয়। সেই রকম একটা মেজাজ এসেছে। ঘরে বসে চা খেতে খেতে বললেন, সাহেবকে না হয় ছেড়েই দিলাম; অন্য যে তিনজন আছে তার মধ্যে দুজনের বিষয় তো তবু কিছু জানা গেছে-সত্যি হোক মিথ্যে হাক।–কিন্তু আমাদের বাংলোর বাবুটির তো নাম পর্যন্ত জানা যায়নি। ওঁর ঘরটায় একবার উকি দিয়ে এলে হত না? মনে হল দরজায় চাবি লাগায়নি।

আমার আইডিয়াটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, চৌকিদার যদি দেখে ফেলে।

লালমোহনবাবু বললেন, আমি যাই, তুমি পাহারা দাও। চৌকিদার। এদিকে আসছে মনে হলে গলা খাকরানি দিলেই আমি চলে আসব। তোমার দাদার কাজ একটু এগিয়ে রাখতে পারলে উনি খুশিই হবেন। এলাহাবাদির সুটকেসটাও রীতিমতো ভারী বলেই মনে হল।

আমি এরকম ব্যাপার কখনও করিনি। অন্তত ফেলুদা ছাড়া অন্য কারুর জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম। আমি চলে গেলাম পিছনের বারান্দায়। সামনে একটা খোলা জায়গার পরেই বাবুর্চিখানার পাশে চৌকিদারের ঘর। চৌকিদারের একটা সাইকেল আছে আগেই দেখেছি, এখন দেখলাম তার দশ বারো বছরের ছেলেটা খুব মন দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করছে। একটা ক্যাঁচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে দেখলাম, লালমোহনবাবু চারের মতো তিন নম্বর ঘরে ঢুকলেন। মিনিট তিনেক পরে আমার বদলে উনিই একটা গলা খাকুরানি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর তদন্তের কাজ শেষ। ঘরে ফিরে যেতে ভদ্রলোক বললেন, পুরনো সুটকেস, ভাবলুম হয়তো চাবি লাগে না, কিন্তু টান দিয়ে খুলল না। টেবিলের ওপর দেখলুম একটা চশমার খাপ—তাতে কলকাতার স্টিফেন কোম্পানির নাম, একটা সোড়া মিন্টের বোতল, আর একটা

ওডোমসের টিউব। আলনায় সবুজ ডোর-কাটা শার্ট আর পায়জামা, মেঝেতে এক জোড়া পুরনো চটি— কোম্পানির নাম উঠে গেছে। এ ছাড়া আর কিছু–

লালমোহনবাবুর কথা থেমে গেল। ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

কার জিনিসের ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে?

ওকে ব্যাপারটা বলতেই হল। ও কিন্তু শুনে বিশেষ রাগটাগ করল না, খালি বলল, লোকটাকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ ঘটেছিল কি?

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কিছুই তো জানা যায়নি। ওর সম্বন্ধে। এমন কী নামটাও না। এদিকে কী রকম ষণ্ডামাক চেহারা.একটা গ্যাঙের কথা বলছিলেন না?–তাই ভাবলুম, মানে...

সন্দেহের কারণ না থাকলে এগুলো করতে যাওয়া অযথা রিস্ক নেওয়া। ভদ্রলোকের নাম আর এন রক্ষিত। সুটকেসের বা ধারে ফ্যাকফেকে সাদা অক্ষরে লেখা, চোখ থাকলেই দেখা যায়। আপাতত এর বেশি জানার কোনও দরকার আছে বলে মনে করি না।

লালমোহনবাবু বললেন, তা হলে বাকি রইল এক সাহেব।

ফেলুদা বলল, সাহেবের নাম স্যাম লুইসন! এও ইহুদি, এও ধনী। নিউ ইয়র্কে এর একটা আর্ট গ্যালারি আছে।

কী করে জানলে? আমি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

গেস্ট হাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হল। বেড়ে লোক। ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। মূর্তি চুরির কথা কাগজে পড়ে অবধি দিন গুনছে কবে এইখানে সেই চারের আবির্ভাব হবে।

তোমার পরিচয় দিলে?

ফেলুদা মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে বলল, ওকে হাতে রাখা দরকার। লোকটা অনেক হেলপ করতে পারবে। তুললে চলবে না, মল্লিক গেস্ট হাউসে থাকে। সে নাকি অলরেড়ি বম্বেতে একটা কল বুক করেছিল, লাইন পায়নি।

রাত্রে ডিনার আমরা চারজনে একসঙ্গে বসে খেলাম! ফেলুদা একটাও কথা বলল না! সেটা তার ছদ্মবেশের জন্য, না মাথায় কোনও চিন্তা ঘুরছে বলে, তা জানি না। মিস্টার রক্ষিত একবার লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির কোনও বিশেষ পিরিয়ড নিয়ে তিনি চর্চা করেন কি না। তার উত্তরে লালমোহনবাবু আড়র ডালে ভেজানো হাতের রুটি চিকোতে চিবোতে বললেন যে পিরামিড নিয়ে তাঁর বিশেষ পড়াশুনো নেই, যদিও সেটা যে মিশরে রয়েছে সেটা তিনি জানেন। এতে রক্ষিত একটু থিতামত খেয়ে আমার দিকে চাইলে আমি নিজের কানের দিকে দেখিয়ে লালমোহনবাবু যে কানে খাটা সেটা বুঝিয়ে দিলাম। এর পরে ভদ্রলোক আর মেজো মামাকে কোনও প্রশ্ন করেননি।

খাওয়ার পরে আমি আর লালমোহনবাবু যখন বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়ালাম (ফেলুদা তার ঘরে চলে গিয়েছিল) তখন একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, আর টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা ফিকে জ্যোৎস্না এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেখেকে জানি হাসনাহানা ফুলের গন্ধ আসছে, মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে, লালমোহনবাবু আ-আ-আ করে। একটা ক্ল্যাসিক্যাল তান দিতে গিয়ে একদম বেসুরে চলে গেছেন, এমন সময় দেখলাম গেস্ট হাউসের দিক থেকে একজন লোক আমাদের দিকে আসছে। আরেকটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। শুভঙ্কর বোস। জটায়ু গান থামিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, তোমার দাদা থাকলে ভাল হত।

আপনারাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন দেখছি।

শুভঙ্করবাবুর মধ্যে একটা উসখুসে ভাব লক্ষ করলাম। দুবার গলা খাকরালেন তিনবার পিছন দিকে চাইলেন, তারপর দুপা এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, ইয়ে—আপনারা নীল শার্টপরা বাঙালি ভদ্রলোকটিকে চেনেন?

এর কাছে লালমোহনবাবুর কালা সাজা চলবে না, কারণ আগে অনেক কথা হয়েছে। বললেন, কই না তো। কেন, উনি কি আমাদের চেনেন বলে বললেন নাকি?

শুভঙ্কর বোস আরেকবার পেছন দিকে দেখে বললেন, লোকটি, মানে, পিকিউলিয়ার। বলছে এলোরায় প্রথম এল, আর্টে ইন্টারেস্টেড, অথচ কৈলাস দেখে একটিবার পর্যন্ত তারিফ করল না, আহা উঁহু করল না। আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম, অথচ সেই প্রথমবারের মতোই থ্রিল অনুভব করলাম। ভালই যদি না লাগে তো আসাই বা কেন, আর ভান করাই বা কেন?

আমরা দুজনে চুপ। এই কথাটাই কি বলতে এলেন ভদ্রলোক?

কাছেই একটা গাছ থেকে একটানা ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে। ছোট্ট শহরটা মনে হচ্ছে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ বেজেছে মাত্র দশটা।

ইয়ে, ইদানীং খবরের কাগজ পড়েছেন? শুভঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

কোন বলুন তো? জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

ভারতবর্ষের শিল্পসম্পদ নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। মন্দির থেকে মূর্তি লোপাট হয়ে যাচ্ছে।

সত্যি? খবরটা জানতুম না তো! কী অন্যায়! ছিছিছি।

লালমোহনবাবুর অ্যাকটিং খুব পাকা নয়, তাই একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু শুভঙ্কর বোসের সেদিকে লক্ষই নেই। আরেক পা এগিয়ে এসে বললেন, ভদ্রলোক কিন্তু গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেছেন।

কোন ভদ্রলোক?

মিস্টার মল্লিক।

বেরিয়ে গেছেন?

প্রশ্নটা আমরা দুজনে একসঙ্গে করলাম। সত্যি, ফেলুদার এখানে থাকা উচিত ছিল।

একবার যাবেন নাকি? শুভঙ্কর বোসের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

এখন? কোথায়? লালমোহনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে।

গুহার দিকে।

গুহায় পাহারা নেই? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আছে, তবে চৌত্রিশটা গুহার জন্য মাত্র দুজন লোক। কাজেই বুঝতেই পারছেন। আর ভদ্রলোক একটা ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন-লক্ষ করেছেন তো? উনি আর আপনাদের বাংলোর হিপি-টাইপের লোকটি-দুজনেই ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। ওরও কিন্তু ভাবগতিক ভাল না। উনি কে সেটা জানতে পেরেছেন?

লালমোহনবাবু বিষম খেতে গিয়ে সামলে নিলেন।

উনি? উনি ফটোগ্রাফ তোলেন। ফাস্ট ক্লাস ফটো। আমাদের দেখিয়েছেন। এলোরার ফটা তুলছেন। চুংকিং-এর কী একটা পত্রিকার জন্য।

বাংলো থেকে কে বেরোলি? মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে টর্চ, গায়ে ঢাউস রেনকোট। ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর কানের কাছে এসে তারস্বরে আফটার ডিনার ওয়াক এ মাইল।–বলে হেসে গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেলেন।

শুভঙ্কর বোসও গুড নাইট বলে রক্ষিতের পথ ধরলেন। লালমোহনবাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, এক মাইল হাঁটতে বললে কেন বলে তো লোকটা?

আমি বললাম, ভাল হজম হবে বলে। ...চলুন, এখন তো বাংলো খালি, একবার ফেলুদার খোঁজ করা যাক। ওকে খবরগুলো দেওয়া দরকার। এরা সবাই গুহার দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাংলোয় ঢুকলাম। মিস্টার বোস সত্যি বললেন কি মিথ্যে বললেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে একবার গুহার দিকে যাওয়া উচিত; যদি কিছু ঘটে তা হলে রাত্রেই ঘটবে। এখনও আলো রয়েছে, গুহার আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা করলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

বাংলোর ভিতরে অন্ধকার। বাইরের চৌকিদারের ঘরে বোধহয় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আর কোথাও আলো নেই। কোনও শব্দও নেই।

রক্ষিতের ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ফেলুদার দরজাও বন্ধ কেন? আর দরজার তলার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন? ও কি এই সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

বারান্দার দিকে ঘরের জানালা। পা টিপে টিপে গেলাম সেদিকে। জানালার পদার্গ টানা। এগিয়ে গিয়ে পদার্ণ ফাঁক করে দুবার চাপা গলায় ফেলুদার নাম ধরে ডাকলাম। কোনও উত্তর নেই। ও যদি বেরিয়েও থাকে, সামনের দরজা দিয়ে বেরোয়নি সেটা আমরা জানি। তা হলে কি চৌকিদারের ঘরের পাশে খিড়কি দরজাটা দিয়ে বোরোল?

আমরা দুজন আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। বাতিটা জ্বালাতেই জানালার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা দেখতে পেলাম। তাতে ফেলুদার হাতে লেখা দুটো কথা–

ঘরে থাকিস।

একটা কথা বলব তোমায়? লালমোহনবাবু বললেন।এবার কিন্তু তোমার দাদটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছেন। আমি তো এমনিতে আর বিশেষ কোনও রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না, তবে তোমার দাদার কার্যকলাপ পদে পদে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

ফেলুদা ঘরে থাকতে বলেছে, কিন্তু কখন ফিরবে সেটা বলে যায়নি। অথচ ও যতক্ষণ না ফেরে। ততক্ষণ ঘুমোনোর কোনও কথাই ওঠে না; কী আর করি-আধা ঘণ্টা কোনওরকমে লালমোহনবাবুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলে কাটিয়ে দিলাম। তারপর লালমোহনবাবু বললেন যে ওঁর লেটেস্ট গল্পের প্লটটা আমায় বলবেন। —এবার একটা নতুন রকমের ফাইট ইন্ট্রোডিউস। করিচি যাতে হিরোর হাত-পা বাঁধা রয়েছে।–কিন্তু তাও শুধু মাথা দিয়ে ভিলেনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে।

মাথা দিয়ে মানে বুদ্ধি দিয়ে না মাথার গুঁতো দিয়ে সেটা জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় দেখি ফেলুদা হাজির। আমরা দুজনেই চুপ, কারণ জানি ও নিজে থেকে কিছু বলতে চাইলেই বলবে, জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হবে না।

ফেলুদা গভীর গলায় বলল, লালমোহনবাবু, অন্যান্যবারের মতো এবারও কি আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে নাকি?

এখানে বলে রাখি লালমোহনবাবুর অস্ত্র সংগ্রহ করার বাতিক আছে। সোনার কেল্লার ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একটা ভুজালি ছিল, আর বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে ছিল একটা বুমেরাং। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। বললেন, এবার আছে একটা বম্ব।

বম্ব? আমি আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলাম। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বম্ব টু বোমা।

লালমোহনবাবু তাঁর সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেছেন। —আমাদের পাড়ার দ্বিজেন তরফদারের ছেলে উৎপল আর্মিতে আছে। সে মার্চ মাসে এসেছিল। এইটে আমায় এনে দিয়ে বললে-কাকাবাবু দেখুন। আপনার জন্য কী এনিচি! বড় বড় যুদ্ধে ব্যবহার হয়। –ছোঁড়া আমার লেখার খুব ভক্ত।

একটা মাঝারি সাইজের টর্চলাইটের মতো লম্বা খয়েরি রঙের একটা বেশ ভারী পাইপ জাতীয় জিনিস লালমোহনবাবু সুটকেস থেকে বের করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা সেটা কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, এটা আমার কাছেই থাক। আপনার পক্ষে জিনিসটা বড় বেশি ডেঞ্জারাস।

কত মেটাগন হবে বলুন তো?

কথাটা আসলে মেগাটন, আর সেটা ব্যবহার হয় অ্যাটমবোমা সম্পর্কে। এক মেগাটন মানে দশ লক্ষ টন। ফেলুদা লালমোহনবাবুর প্রশ্নে কান না দিয়ে বামাটা ঝোলায় পুরে বলল, একবার বেরোনো দরকার। সবাই বেরিয়েছে, আমাদের ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

ডাক বাংলো থেকে যখন বেরোলাম তখন সাড়ে এগারোটা। বিক্সিটা এখনও ডাকছে। চাঁদের আলো কমছে-বাড়ছে, কারণ আকাশ টুকরো টুকরো চলন্ত মেঘে ছেয়ে গেছে। গেস্ট হাউসের একটা ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে। সেটা নাকি সেই আমেরিকগনের ঘর; কে কোন ঘরে থাকে সেটাও নাকি ফেলুদা ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। মল্লিক আর শুভঙ্কর ফিরেছে কি না বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ থেকেই ঘন ঘন মেঘ ডাকছিল; যখন বড় রাস্তার উপর এসে পড়েছি তখন একটা বড়ুরকম গর্জন শুনে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি পুব দিকটা কালো হয়ে আসছে। এই মরেছে। বৃষ্টি আসবে নাকি? বলে উঠলেন লালমোহনবাবু!

এত গুহা থাকতে বৃষ্টি এলে আশ্রয়ের অভাব হবে না, বলল ফেলুদা।

কৈলাসের দিকে উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোনও চেষ্টা না করে ফেলুদা বা দিকের পথ ধরল। কিন্তু সে পথেও বেশি দূর না। খানিকটা গিয়েই সে দেখি পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওর কায়দাকানুন একটু আধটু জানি বলে আন্দাজ করলাম যে সামনের দিক দিয়ে ছাড়া গুহায় ঢোকার কোনও রাস্তা আছে কি না সেটাই ও একটু ঘুরে দেখতে চাইছে। আশেপাশে ঝোপঝাড় আর পাথরের টুকরো, কিন্তু এখনও চাঁদের আলো থাকায় সেগুলো কোনও বাধার সৃষ্টি করছে না।

এইবার ফেলুদা ডান দিকে মোড় নিল। বুঝলাম য়ে-দিক থেকে এসেছি সেদিকেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু রাস্তা দিয়ে নয়; পাহাড়ের গা দিয়ে-রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে।

খানিকটা গিয়েই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দৃষ্টি ডান দিকে। আমরা থেমে সেইদিকে দেখলাম।

দূরে পশ্চিম দিকে ঠিক যেন মনে হচ্ছে জমির উপর একটা সিল্কের ফিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আসলে সেটা শহরে যাবার রাস্তা, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে।

সেই রাস্তা দিয়ে একজন লোক দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে গেস্ট হাউসের দিকে। অথবা বাংলোর দিকে। কারণ রাস্তা একটাই।

মিস্টার রক্ষিত নন, ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু।

কী করে বুঝলেন? চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

রক্ষিতের গায়ে রেনকোট ছিল।

কথাটা ঠিকই বলেছেন লালমোহনবাবু।

লোকটা একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...খস্‌স্‌...

একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে আমরা তিনজন আবার থেমে গেলাম। কোথেকে আসছে অ্যাওয়াজটা?

ফেলুদা বসে পড়ল। আমরাও। সামনে একটা প্রকাণ্ড মনসার ঝোপ। সেটা আমাদের আড়াল করে রেখেছে।

আওয়াজটা আরও কিছুক্ষণ চলে থামল। তারপর সব চুপ।

এ কী-চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কেন? আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সেই কালো মেঘট চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে। আমরা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম। খানিকটা হাঁটার পর ডানদিকে কৈলাসের খাদটা পড়ল। খাদের পাশেই...ওঁই যে মন্দির। মন্দিরের চূড়ো এখন আমাদের সঙ্গে সমান লেভেলে। চূড়োর পিছনে বেশ খানিকটা নিচুতে একটা ছাত—তার মাথায় চারটে সিংহ চারিদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে নীচে দূরে হাতি দুটো দেখা যাচ্ছে।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। আওয়াজটা এদিক থেকেই এসেছে সেটা বুঝেছিলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। হয়তো আছে, অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না। আমি জানি ফেলুদা টর্চ জ্বালাবে না, কারণ তা হলে অন্য লোক আমাদের কথা জেনে যাবে।

কৈলাসের খাদের পর কিছু দূর গিয়ে আরেকটা খাদ। এটা পনেরো নম্বর গুহা। সেটা ছাড়িয়ে তার পরের গুহাটার দিকে এসেছি। এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ থেমে টান হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস কথা–

টর্চ জ্বেলেছে। পনেরো নম্বর গুহার ভিতরে। তার ফলে গুহার বাইরের আলোটা একটু বেড়েছে।

আমি ব্যাপারটা লক্ষ করিনি। লালমোহনবাবুও না। ফেলুদার চোখই আলাদা।

দু মিনিট প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ফেলুদা একটা ব্যাপার করল। একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ওপর থেকে গুহার সামনের চাতালটায় ফেলল। টুপ করে একটা শব্দ পেলাম।

তারপর বুঝতে পারলাম চাতালটা হঠাৎ যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। তার মানে টর্চটা নিভল। আর তার পরেই একটা লোক নিঃশব্দে চোরের মতো গুহা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।

মিস্টার রক্ষিত না, আবার ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু। লোকটাকে চিনতে না পারলেও, তার গায়ে যে রেনকোট নেই সেটা আমিও বুঝেছিলাম।

এরপর এল আমার জীবনের সবচেয়ে লোমখাড়া করা সময়। ফেলুদা ইতিমধ্যে নীচে যাবার একটা রাস্তা বার করে ফেলেছে। রাস্তা না বলে বোধ হয় উপায় বলা উচিত। খানিকটা লাফিয়ে, খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে, খানিকটা বাঁদরের মতো ঝুলে, খানিকটা মাটির উপর ঘষটে, সে দেখতে দেখতে নীচে গুহার সামনেটায় পৌঁছে গেল। লালমোহনবাবু চাপা। গলায় বললেন, গোয়েন্দাগিরিতে ফেল করলে সাকাসের চাকরি বাঁধা। পরমুহূর্তেই দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মানে গুহার ভিতর ঢুকেছে। আমার কিন্তু ঘাম ছুটে লোমটোম খাড়া হয়ে গেছে।

প্রায় তিন মিনিট (মনে হচ্ছিল তিন ঘণ্টা) পরে আবার দেখতে পেলাম ফেলুদাকে। তারপর আরম্ভ হল উলটো কসরত। উপর থেকে নীচের বদলে নীচের থেকে উপরে। এক হাতে টর্চ কাঁধে ব্যাগ আর কোমরে রিভলভার নিয়ে কীভাবে এরকম ওঠা নামা সম্ভব তা ও-ই জানে। উপরে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এটার নাম দশাবতার গুহা। দোতলা। দুন্দর্যন্ত সব মূর্তি আছে। লোভনীয়।

লোকটা কে ছিল বুঝলে?-ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ফেলুদার মুখ গভীর হয়ে গেল! বলল, যত সহজ ভাবছিলাম, তা নয়। প্যাঁচ আছে। রহস্য আছে। মাথা খাটাতে হবে।

পাহাড় থেকে নেমে এসে বুঝলাম তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। ফেলুদা কৈলাসের সামনে গিয়ে পাহারাদারের সঙ্গে দেখা করল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোনও গোলমেলে ব্যাপার লক্ষ করেনি। অবিশ্যি ও যেখানে পায়চারি করছে সেখান থেকে খাদের উপরটা দেখা যায় না; মন্দিরের চূড়োয় ঢাকা পড়ে।

কোনও শব্দ-টব্দ শোনোনি?-ফেলুদা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল।

না, শব্দও শোনেনি। এমনিতেই মেঘ ডাকছে ঘন ঘন, শব্দ কী করে শুনবে?

একবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখতে পারি?

জানতাম লোকটা না বলবে, আর বললেও তাই।

নেহি বাবু, অর্ডার নেহি হ্যায়।

ফেরার পথে বাংলোর কাছাকাছি এসে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। আমরা আসছিলাম পুব দিক দিয়ে। বাংলোর পুব দিকের দেয়ালে দুটো জানালা রয়েছে-একটা রক্ষিতের ঘরের, একটা ফেলুদার ঘরের। ফেলুদার ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু রক্ষিতের ঘরের ভেতর একটা আলোর তাণ্ডব চলেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা টর্চের আলো, কিন্তু সেটা কেন যে পাগলের মতো এদিক ওদিক করছে সেটা বোঝা মুশকিল। একবার আলোটা জানালার কাছে এল। বুঝলাম সেটা গেস্ট হাউসের দিকে ফেলা হচ্ছে। আলোটা ঝোপঝাড়ের উপর ঘোরাফেরা করে আবার ঘরে ফিরে গেল। ফেলুদা চাপা গলায় মন্তব্য করল, হাইলি ইন্টারেস্টিং।

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

০৮. অ্যাডভেঞ্চারগুলো কখন যে কোন রাস্তায় চলবে

আমি অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো কখন যে কোন রাস্তায় চলবে সেটা আগে থেকে বোঝা ভারী মুশকিল হয়। কিছুদূর হয়তো আন্দাজ-মাফিক গেল, তারপর হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল। যার জন্য রাস্তার মোড় গেল ঘুরে; ফেলুদার মাথা আশ্চর্য ঠাণ্ডা বলে ও বাধা পেলেও বা বেকায়দায় পড়লেও কখনও দিশেহারা হয় না। কিন্তু আজি একটা ব্যাপারে তাকে বেশ বিরক্ত হতে দেখলাম।

কাল রাত্রে কৈলাসের ওপরে গিয়ে যে শব্দটা শুনেছিলাম, সে ব্যাপারে একটু তদন্তের দরকার বলে আমরা ঠিক করেছিলাম ভোরে ভোরেই কৈলাস চলে যাব। ফেলুদা রাত্রে মেক-আপ তুলে শুয়েছিল, আজ সকালে আমাদেরও আগে উঠে সে তৈরি হয়ে নিয়েছে, আর আমিও সিঁথিটা ডান দিকে করে নিয়েছি। লালমোহনবাবুও কোনও একটা কিছু মেক-আপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা বারণ করাতে চুপ করে গেলেন। সূযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুহাঁ খুলে যায়, লোক ঢুকে দেখতে পারে। সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে বেরিয়ে ছাঁটার মধ্যে গুহায় পৌঁছে বাইরে বড় বড় গাড়ি আর লোকজনের ভিড় দেখে একেবারে তাজব বনে গেলাম।

আরেকটু কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। ফিল্ম কোম্পানি এসেছে, কৈলাসে শুটিং হবে। একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে শুটিং দেখেছিলাম, তখন রিফ্লেক্টর জিনিসটা দেখে চিনে রেখেছিলাম; এবারও সেই রিফ্লেক্টর দেখেই শুটিং-এর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, সেরেছে—এরা আর জায়গা পেল না? শেষটায় কৈলাসের শ্রাদ্ধ করতে এসেছে?

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে দলটা বোম্বাই থেকে এসেছে, হিন্দি ফিল্মের শুটিং হচ্ছে। যারা অ্যাকটিং করবে তারা নাকি এখনও এসে পৌঁছয়নি, তবে অন্য সব কাজের লোক বেশির ভাগই এসে পড়েছে।

একজন ইয়ং ছেলের প্যান্টের পকেট থেকে একটা বাংলা ফিল্ম পত্রিকার খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে দেখে লালমোহনবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বই হচ্ছে ভাই? ছেলেটি বলল, ক্রোড়পতি।

কে কে পার্ট করতে?

টপ কাস্টিং। এখানে আসছে রূপা, অর্জ্জুন মেরহাত্রা আর বলবন্ত চোপরা। হিরোইন, হিরো আর ভিলেন।

অর্জ্জুনের নাম শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, গান হবে নাকি ভাই?

না। ফাইট। স্টান্টম্যান, ডাবল–সব এসেছে। হিরো ভিলেনকে চেজ করবে, ভিলেন গুহা থেকে মন্দিরের ভেতর ঢুকে যাবে।

আর হিরোইন?

হিরোইন সাইডের একটা কেভের মধ্যে রয়েছে। ওখানে ভিলেন ওকে অ্যাটাক করছে। হিরো এসে পড়ছে, ভিলেন পালাচ্ছে। ক্লাইম্যাক্স মন্দিরের চূড়োয়।

চূড়োয়!

চূড়োয়।

পরিচালক কে?

মোহন শর্মা। কিন্তু এই শুটিংটায় থাকছে ফাইট ড্রাইরেক্টর আপ্পারাও।

আরও জিজ্ঞেস করে জানলাম যে শুটিং হতে হতে দশটা, আর দুপুরেই কাজ শেষ। তার মানে আজকের দিনটা এরাই কৈলাসটা দখল করে রাখবে।

তাজ্জব ব্যাপার! ফেলুদা বলল।–এই পারমিশনটা পাওয়া কীভাবে সম্ভব হল জানতে ইচ্ছে করে। টাকায় কীই না করে।

ভেতরে না ঢুকতে পারলেও কাল রাত্রে যেখানে পাহাড়ের উপরে খাদের পাশটায় গিয়েছিলাম, সেখানে যেতে আশা করি কোনও অসুবিধা নেই। তাই ভেবে কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু সে গুড়েও বালি! আমাদের আগেই ফিল্মের দলের কিছু লোক সেখানে হাজির হয়ে গেছে। তার মধ্যে একজন বোধহয় ক্যামেরাম্যান, কারণ সে ডান হাতের আঙুলগুলো ফুটাস্কোপের মতো করে চোখের সামনে পাকিয়ে ধরে মন্দিরের চুড়োর দিকে দেখছে। মন্দিরের ভিতর কিন্তু এখনও কোনও লোক ঢোকেনি। নীচে থাকতেই জেনেছিলাম। পারমিশনের চিঠিটা নাকি অন্য গাড়িতে আসছে। দারোয়ান যতক্ষণ না চিঠিটা দেখছে। ততক্ষণ কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।

ফেলুদা জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বলল, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এরা আমাদের কাজটা পণ্ড করতেই এসেছে। চল, একবার পনেরো নম্বর গুহাটায় যাই।–ভাল মূর্তি আছে। এই উদাত্ত পরিবেশে ফিল্ম কোম্পানির কচকচ ভাল লাগছে না।

আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম তার উলটোদিক দিয়ে নেমে পনেরো নম্বর গুহার দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম মেন রোড দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হলদে আমেরিকান গাড়ি কৈলাসের দিকে আসছে। বুঝলাম হিরো হিরোইন ভিলেন আর ফাইট ডাইরেক্টর এসে গেছেন।

পনেরো নম্বর গুহাই হল দশাবতার গুহা। তার সামনে পৌঁছানোর আগেই দুই অবতারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন হলেন মিস্টার রক্ষিত, আর অন্যজন মিস্টার লুইসন। গুহার মুখটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দুজন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমেরিকানটি, আই সি নো · পয়েন্ট ইন মাই স্টেইং হিয়ার এনি লঙ্গার বলে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মিস্টার রক্ষিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে তেতো হাসি হেসে বললেন, এখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্বন্ধে কমপ্লেন করছিল। বলছে ডিমটা পর্যন্ত ঠিক করে ভাজতে জানে না, আর আশা করে যে আমরা এখানে এসে ডলার ঢেলে দিয়ে যাব। টাকার গরম আর কী!

ফেলুদা বলল, আশ্চর্য তো। শুনেছিলাম আর্টের সমঝদার, আর এখানে এসে ডিম ভাজার কথাটাই মনে হল?

রক্ষিত কী জানি একটা উত্তর দিতে গিয়ে আর দিতে পারলেন না। কৈলাসের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার এসে আমাদের সকলেরই পিলে চমকে দিয়েছে। লালমোহনবাবু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ফাইট শুরু হয়ে গেছে মশাই! ভিলেন চ্যাঁচাচ্ছে!

চিৎকারের পর আরও অন্য গলায় চোচামেচি শুরু হয়েছে। ফাইট হলে এত লোক চেচাবে কেন? আমরা ফেলুদার পিছন পিছন ব্যস্তভাবে কৈলাসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এত ছুটোছুটি গোলমাল কীসের জন্য?

যখন গেটের কাছাকাছি এসে গেছি তখন দেখলাম চার-পাঁচজন লোক চ্যাংদোলা করে একটি বেগুনি হাওয়াইয়ান শার্ট পরা লোককে হলদে গাড়িটার দিকে নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এল হিরো হিরোইন আর ভিলেন। এদের তিনজনেরই মুখ চেনা। রূপা অর্জ্জুনের কাঁধে ভর করে এগিয়ে আসছে,

বলবন্ত তাদের পাশেই মাথা হেঁট করে রূপার কাঁধে একটা হাত দিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এবারে সেই বাঙালি ছেলেটিকে দেখে আমরা চারজনেই তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কী হয়েছে মশাই? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

লাশ পড়ে আছে। মন্দিরের পেছন দিকে... হরিবল ব্যাপার...হাড়গোড় সব....

চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল কাকে?

আপ্পারাও। উনিই প্রথম দেখলেন, আর দেখেই সেনসলেস।

ফেলুদা আর মিস্টার রক্ষিত আগেই মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিল। এবার আমরা দুজনও গেলাম; ফিল্মের লোকজন সব বেরিয়ে আসছে, বুঝলাম শুটিং আর হবে না।

মন্দিরের বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, ডানদিকে কৈলাসের নীচের দিকটায় সারি সারি হাতি আর সিংহের মূর্তি; মনে হয় তারাই যেন মন্দিরটাকে কাঁধে করে রয়েছে। সামনে মাড় ঘুরে ডান দিকে গিয়েই বাধহয় মৃতদেহ, কারণ সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা পৌঁছানোর আগেই মিস্টার রক্ষিত ভিড় থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ওদিকে যাবেন না। বিশ্রী ব্যাপার। আমারও যে খুব একটা যাবার ইচ্ছে ছিল তা নয়, কারণ এ ধরনের রক্তাক্ত দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে না; তবু কে মারা গেছে জানার ভীষণ কৌতুহল হচ্ছিল। সে কৌতুহলটা মিটিয়ে দিল ফেলুদা। মিস্টার রক্ষিত চলে আসবার এক মিনিটের মধ্যেই ফেলুদাও ফিরে এসে বলল, শুভঙ্কর বোস। মনে হয় পাহাড়ের উপর থেকে সোজা পড়েছেন পাথরের মাটিতে।

লালমোহনবাবু শুনলাম বিড়বিড় করে বলছেন, আশ্চর্য। ঠিক এইভাবেই মরবার কথা ঘনশ্যাম কর্কটের।

ফেলুদা আবার বাইরের দিকে চলেছে, আমরা দুজন তাঁর পিছনে। মিস্টার রক্ষিত এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের আসতে দেখে থেমে বললেন, কাল রাত্রে যখন এদিকটায় বেড়াতে আসি, তখনই দেখলাম ভদ্রলোক পাহাড়ের উপর উঠছেন। আমি বারণ করেছিলাম। ভদ্রলোক আমার কথায় কানই দিলেন না। তখন কি জানি যে লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?

মিস্টার রক্ষিত চলে গেলেন। একটা নতুন কথা বলে গেলেন বটে। ভদ্রলোক। আত্মহত্যার কথাটা আমার মনেই হয়নি। ফেলুদা মিস্টার রক্ষিতের কথায় যেন আমল না। দিয়েই আবার কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল।

আধঘণ্টা আগেই দেখেছিলাম খাদের পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, এখন দেখছি একটি লোকও নেই। মনে মনে বললাম শুভঙ্কর বাস মরে গিয়ে আমাদের কাজের সুবিধে করে দিয়েছেন।

ফেলুদা দেখলাম বেশ বেপরোয়াভাবে এগিয়ে গিয়ে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাড় নিচু করে মন্দিরের পিছনে যেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানটা দেখছে। যেখান থেকে পড়েছেন শুভঙ্কর বাস, সেই জায়গাটা আন্দাজ করে ও খাদের আশপাশটা খুব ভাল করে দেখতে লাগল।

মাটিতে একটা গর্ত। লোক চলাচলে মাটি ঢুকে সেটা খানিকটা বুজে এসেছে, কিন্তু তাও ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা স্কেলটা খুলে তার মধ্যে ঢোকাতে সেটা প্রায় দেড় হাত ভেতরে চলে গেল। গর্তটা খাদ থেকে হাত তিনেক দূরে। এবার ফেলুদা গর্তটার ঠিক সামনে খাদের ধারটা পরীক্ষা করতে লাগল। আমি আর লালমোহনবাবুও দেখছি আর বেশ বুঝতে পারছি কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খাদের ধারের মাটির উপর একটা গভীর খাঁজ পড়েছে।

কিছু বুঝতে পারছিস, তোপসে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। আমি চুপ করে আছি দেখে সে নিজেই উত্তর দিল—

এটা দড়ির দাগ। একটা শাবল গোছের জিনিস গভীরভাবে পুঁতে সেটায় একটা দড়ি বেঁধে খাদের ভিতর ঝুলিয়ে সেটা ধরে কেউ নেমেছিল বা নামতে চেষ্টা করেছিল। কাল রাত্রে খস খসি শব্দটা মনে পড়ছে? সেটা ছিল দড়িটাকে টেনে তোলার শব্দ। সামনে দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, তাই পিছন দিয়ে ঢোকার এই ব্যবস্থা।

লালমোহনবাবু বললেন, কিন্তু দড়ি হলে...একশো ফুট.মানুষ ধরে নামবে...সে তো মোক্ষম দড়ি হতে হবে মশাই।

নাইলনের দড়ি। হালকা, অথচ প্রচণ্ড শক্ত, বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, তার মানে তো শুভঙ্কর বোস ছাড়া আরেকজন লোক ছিল?

ন্যাচারেলি। সেই লোকই দড়ি টেনে তুলেছে, সেই শাবল-দড়ি সরিয়ে ফেলেছে। সে শুভঙ্কর বোসের শত্রু বা মিত্র সেটা এখনও ষোলো আনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে একটা কারণে শত্রু বলেই মনে হয়।

আমরা ফেলুদার দিকে চাইলাম। ফেলুদা তার শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে হাতের তেলোয় ধরে আমাদের দেখাল।

একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। নীল রঙের কাপড়। কাল কাকে দেখেছি নীল শার্ট গায়ে?

মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক।

কোথায় পেলে ওটা?—কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। ফেলুদা বলল, উপূড় হয়ে পড়েছিল শুভঙ্কর বাস। হাত দুটো ছড়ানো। বাঁ হাতটা মুঠো অবস্থায়। দু আঙুলের মাঝখান দিয়ে টুকরোটা বেরিয়ে ছিল। দুজনে ধস্তাধস্তি হয় খাদের ধারে। শুভঙ্কর শার্ট খামচিয়ে ধরে। তারপর পড়ে যায়। টুকরোটা হাতে ছিঁড়ে আসে।

ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন। ত্‌তার মানে তো ম্‌-মাডার।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় কোনও মন্তব্য না করে গভীরভাবে বলল, একটা কথা বলতেই হবে— কৈলাস এখনও অক্ষত রয়েছে, আর সেটার জন্য দায়ী শুভঙ্কর বোস। তিনি মরলেন বলেই মূর্তি চারকে কাজ না সেরেই পালাতে হল। আর সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে গেল। কৈলাসে সত্যিই লাশ পাওয়া গেল

০৯. ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা

খাদের মাথা থেকে যখন নীচে নামলাম ততক্ষণে ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা সরে পড়েছে। তার বদলে এখন স্থানীয় লোকের ভিড়। আর আমেরিকান গাড়ির বদলে রয়েছে একটা জিপ। একজন বছর পয়ত্রিশের স্মার্ট ভদ্রলোক ফেলুদাকে দেখে এগিয়ে এলেন। ইনিই নাকি মিস্টার কুলকার্নি-টুরিস্ট গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। ফেলুদার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা হল। ভদ্রলোক বললেন, কাল রাত্রে যে মিস্টার বোস ফেরেননি। সেটা আজ ভোরে জানা গেছে। একটি বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম ওর খোঁজ করতে, সে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

এখন কী ব্যবস্থা হচ্ছে? ফেলুদা প্রশ্ন করল। কুলকার্নি বললেন, আওরঙ্গাবাদে খবর পাঠানো হয়েছে। সি ডি ভ্যান আসছে, ডেডবডি মর্গে নিয়ে যাবে। মিস্টার বোসের ভাই আছেন দিল্লিতে। লাশ সনাক্ত করার ব্যাপারে তাকে খবর পাঠানো হচ্ছে। ...ভেরি স্যাড! ভদ্রলোক সত্যিই পণ্ডিত ছিলেন। আগেও একবার এসেছিলেন—সিকসটি এইটে। গেস্ট হাউসেই ছিলেন। এলোরার ওপর বই লিখছিলেন।

আপনাদের এখানে থানা নেই?

একটা পুলিশ আউটপোস্ট আছে। ছোট জায়গা তো! একজন অ্যাসিসন্টান্ট সাব-ইনসাপেক্টর চার্জে আছেন। মিস্টার ঘোটে। আপাতত ডেডবডি ইনসাপেক্ট করছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?

সার্টেনলি!...ভাল কথা—

কুলকার্নি কী যেন একটা গোপনীয় কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু আমরা দুজন বাইরের লোক রয়েছি বলে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, আপনি এদের সামনে বলতে পারেন। কুলকার্নি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, আজ সকালে বম্বেতে একটা ট্রাঙ্ক কল হয়েছে।

মল্লিক?

হ্যাঁ।

কী বলল নোট করেছেন?

কুলকার্নি পকেট থেকে একটা কাগজের স্লিপ বার করে সেটা থেকে পড়ে বললেন, মে বালু আচে। আজ রওয়ানা হচি।

মেয়ে ভাল আছে, আজ রওনা হচ্ছি। আবার সেই মেয়ের ব্যাপার।

যাবার কথা বলেছে কিছু? ফেলুদা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন করল।

কুলকার্নি বললেন, উনি তো আজই সকলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবেই একটা ফন্দি বার করে যাওয়াটা পিছিয়ে দিয়েছি। ওর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টিপে দিয়েছি। ডিফারেনসিয়াল গণ্ডগোল—গাড়ি সারাতে টাইম লাগবে।

ব্রাভো! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।

ফেলুদার তারিফে কুলকার্নির চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, ভাল কথা-আপনার এই ঘোটে লোকটি কেমন?

বেশ লোক। তবে মনমরা হয়ে থাকে। এ জায়গা তার ভাল লাগে না। কবে। প্রোমোশন হবে, আওরঙ্গাবাদে পোস্টেড হবে, তাই দিন গুনছে। ...আসুন না, আলাপ করিয়ে দিই।

মিস্টার ঘোটে কেভ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কাছাকাছির মধ্যেই ছিলেন, কুলকার্নি তাঁকে ডেকে এনে ফেলুদাকে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট, চওড়াতেও প্রায় ততখানিই বলে মনে হয়, তার উপরে আবার চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ। কিন্তু মোটা হলে কী হবে, হাঁটাচলা বেশ চটপটে।

ঘোটের সঙ্গে কথা বলার আগে ফেলুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল, তোরা বরং বাংলোয় ফিরে যা- আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।

কী আর করি। গেলাম ফিরে বাংলোয়। ভোরে শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তাই বেশ খিদে পাচ্ছিল। বারান্দায় গিয়ে চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে দুজনের জন্য ডিমরুটি করতে বলে দিলাম।

ঘরে ফিরে এসে দেখি লালমোহনবাবু কেমন যেন বোকা বোকা ভাব করে খাটে বসে আছেন। আমার্কে দেখে বললেন, আমরা কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে। গিয়েছিলাম?

আমি বললাম, না তো। নেবার মতো কীই বা আছে বলুন! তা ছাড়া এরা তো সকালবেলা ঘর ঝাড়পোছ করে, তাই...কেন, কিছু হারিয়েছে নাকি?

না, কিন্তু জিনিসপত্তর সব ওলট-পালট হয়ে আছে। আমার খাটে বসে আমার বাক্স ঘেঁটেছে। এই কিছুক্ষণ আগে। খাট এখনও গরম হয়ে আছে। তোমার বাক্সটা দেখো তো।

সুটকেসটা খোলামাত্র বুঝতে পারলাম সেটা কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানে নেই। শুধু বাক্স না, বালিশ-টালিশও এদিক ওদিক হয়ে আছে। এমন কী খাটের তলাতেও যে খুঁজেছে সেটা আমার চটি জোড়া যেভাবে রাখা হয়েছে তার থেকে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবু বললেন, কীসের জন্য সবচেয়ে ভয় ছিল জান? আমার নেটবুকটা। সেটা দেখছি নেয়নি।

অন্য কিছু নিয়েছে নাকি?

কই, কিছুই তো নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তোমার?

আমারও তাই। কিছুই নেয়নি। যে এসেছিল সে বিশেষ কোনও একটা জিনিস খুঁজতে এসেছিল। সেটা পায়নি।

একবার চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? কিন্তু চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। সে বাজার করতে গিয়েছিল, তখন যদি কেউ এসে থাকে। এখানে কোনওদিন কিছু চুরিটুরি যায় না, কাজেই বাইরের লোক এসে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যাবে এটা তার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগল।

হঠাৎ মনে হল ফেলুদার ঘরে লোক ঢুকেছিল কি না জানা দরকার। গিয়ে দেখি ফেলুদা দরজা লক করে গেছে। সেটার অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ও নিজে ছদ্মবেশে রয়েছে বলে ওর একটু সাবধান হতে হয়। লালমোহনবাবু বললেন, একবার মিস্টার রক্ষিতকে জিজ্ঞেস করবে নাকি?

কাল-রাত্রে জানাল দিয়ে টর্চের খেলা দেখে আমার এমনিই রক্ষিত সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবুর প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে দুজনে ভদ্রলোকের দরজায় গিয়ে আস্তে করে টাকা মারলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা খুলে গেল।

কী ব্যাপার? ভেতরে এসে।

ভদ্রলোক যে খুব একটা খুশি খুশি ভাব দেখালেন তা নয়; তাও যখন ডাকছেন তখন গেলাম।

আপনার ঘরেও কি লোক ঢুকেছিল? লালমোহনবাবু ঢুকেই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে তাকাতেই বুঝলাম ভাবগতিক ভাল না। চাপা অথচ ঝাঁঝালো গলায় বললেন, আপনাকে বলে তো লাভ নেই, কারণ আপনি কানে শোনেন না, কাজেই আপনার ভাগনেটিকেই বলছি। —লোক শুধু ঢোকেনি, আমার একটি অত্যন্ত কাজের জিনিস সযত্নে তুলে নিয়ে গেছে।

কী জিনিস? আমি ভয়ে ভায়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার রেনকোট। বিলিতি রেনকোট। আজ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবহার করছি।

মেজোমামা চুপ। কালা সেজে আছেন। আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে তাকে খবরটা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, কাল রাত্রে নিয়েছিল কি? কাল দেখলুম। আপনি কী যেন খুঁজছেন। আপনার টর্চটা...

না। কাল রাত্রে একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছিল। বাতি নিভিয়ে টর্চ জেলে সেটাকে তাড়াতে চেষ্টা করছিলুম। কাল আমার কোনও জিনিস খোয়া যায়নি। গেছে আজ। সকালে। আর আমার ধারণা সেটা নিয়েছে চৌকিদারের ওই ছেলেটা।

এ কথাটাও চেঁচিয়ে মেজোমামাকে শুনিয়ে দিলাম। উনি বললেন, শুনে দুঃখিত হলাম। ছেলেটির দিকে চোখ রাখতে হয় এবার থেকে।

এর পরে আর কিছু বলার নেই। আমরা ভদ্রলোককে ডিসটর্ব করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চৌকিদার ডিমরুটি এনে দিয়েছিল, দুজনে খাবার ঘরে বসে খেলাম। আমেরিকায় ডিম কী করে ভজে জানি না, আমাদের এই খুলদাবাদের ডিম ফ্রাই বেশ ভালই লাগছিল। ঘরে কে ঢুকে থাকতে পারে সেটা ভাবতে মনটা খচা খচা করছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা হয়তো সত্যিই চৌকিদারের ওই

ছেলেটা! ও মাঝে মাঝে বাংলোর পশ্চিমদিকের মাঠটাঁয় পায়চারি করে, আর পদার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে দেখে, সেটা লক্ষ করেছি।

যদিও ফেলুদা বাংলোয় ফিরে যেতে বলেছিল, তার মানে যে ঘরেই বসে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে কি? চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা বাংলোর বাইরে রাস্তায় এলাম।

বাংলোর ঠিক সামনে থেকে গেস্ট হাউসটা দেখা যায় না, একটা অচেনা গাছ সামনে পড়ে। গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ পেয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। এবার গেস্ট হাউসটা দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গাবাদ থেকে যে ট্যাক্সিটা মিস্টার রক্ষিত আর লুইসনকে নিয়ে এসেছিল, সেটা যাবার জন্য তৈরি, ছাতের উপর মাল চাপানো রয়েছে, আমেরিকান ক্রোড়পতি মিস্টার স্যাম ল্যুইসন বেয়ারাকে বকশিশ দিচ্ছেন।

কিন্তু ইনি আবার কে?

আরেকটি লোক গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, লুইসনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছেন। লুইসন দুবার মাথা নাড়ল। তার মানে কোনও একটা প্রস্তাবে রাজি হল। এবার অন্য ভদ্রলোকটি আরার গেস্ট হাউসে ঢুকে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে বেরোলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ডালা খুলে দিল। বাক্স ভিতরে ঢুকে গেল। ডালা বন্ধ হল। আমার বুকের ভিতর ভীষণ ধুকপুকুনি। লালমোহনবাবু আমার হাত খামচে ধরলেন।

জয়ন্ত মল্লিক নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে আমেরিকানের সঙ্গ নিয়ে পালাচ্ছেন।

ড্রাইভার তার জায়গায় গিয়ে বসল।

চৌকিদারের সাইকেল?-আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট দেবার শব্দ পেলাম।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে কোনও রকমে টেনে হিঁচড়ে সাইকেলটাকে বাইরে আনলাম।

উঠে পড়ুন।

লালমোহনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি জীবনে এই প্রথম সাইকেলের পিছনে চাপলেন। আমি জানি অন্য সময় হলে চাপতেন না-কিন্তু অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া গতি নেই।

ট্যাক্সি বেরিয়ে চলে গেছে। আমি প্রাণপণে পোডাল করে চলেছি। জটায়ু আমার কোমর খামচে ধরেছেন। সাত বছর বয়সে সাইকেল চালাতে শিখেছি। ফেলুদাই শিখিয়েছিল। অ্যাদ্দিনে সেটা কাজে দিল।

বিশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেলাম। ওই যে ফেলুদা-ওই যে ঘোটে, কুলকার্নি।

ফেলুদা! মিস্টার মল্লিক পালিয়েছেন-সেই আমেরিকানের ট্যাক্সিতে-এই পাঁচ মিনিট আগে?

এই একটা খবরের দরুন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটে গেল যে, এখনও ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। জিপিও যে ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পিড়ে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম জানলাম। আমি আর জটায়ু পিছনে ঘাপটি মেরে বসে আছি, সামনে ড্রাইভারের পাশে ঘোটে আর ফেলুদা, দেখতে দেখতে ট্যাক্সি কাছে চলে আসছে, তারপর হর্ন দিতে দিতে সেটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল, ক্রোড়পতি লুইসনের চোখরাঙনি আর ১ বাছাই বাছাই মার্কিনি গালির বিস্ফোরণ, আর তারই মধ্যে মল্লিকের ফ্যাকাসে মুখ, একবার বাধা দিতে গিয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়া, আর তারপর ঘোটে তার সুটকেস খুলল, আর তা থেকে টার্কিশ টাওয়েলের প্যাঁচ খুলে বেরোল যক্ষীর মাথা, আর লালমোহনবাবুর হাফ ছেড়ে বলা এন্ডস ওয়েল দ্যাট অলস ওয়েল, আর লুইসনের হা হয়ে যাওয়া আর দুবার বাট...বাট বলা, আর সবশেষে লুইসন ট্যাক্সি করে আওরঙ্গাবাদ, আর আমরা বামাল সমেত চোর গ্রেপ্তার করে খুলদাবাদ।

মল্লিক অবিশ্যি এখন ঘোটের জিম্মায়। অর্থাৎ তিনি এখন খুলদাবাদ পুলিশ

আউটপোস্টের বাসিন্দা। ভদ্রলোক এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনও কথাই বলতে পারেননি।

ঘোটে আমাদের গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিলেন, কারণ কুলকার্নি ওখানে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মিশন সাকসেসফুল শুনে কুলকার্নি অবিশ্যি দারুণ খুশি হলেন, কিন্তু ফেলুদা যেন তার উৎসাহে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলেই বলল যে, এখনও কাজ বাকি আছে। -আর তা ছাড়া আপনি বম্বের ওই নাম্বারটা নিয়ে কিন্তু এনকোয়ারিটা করবেন, আর খবর পেলেই আমাকে জানাবেন।

শেষের ইনস্ট্রাকশনটার ঠিক মানে বোঝা গেল না, তবে এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন আছে বলেও মনে হল না।

কুলকার্নি সকলের জন্য কফি বলেছিলেন, সেটা খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়লে আমাদের ঘরে যে লোক ঢুকে জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, আর রক্ষিতের ঘর থেকে রেনকোট চুরি গেছে, সে খবরটা

ফেলুদাকে দেওয়া হয়নি। সেটা ওকে বলতে ও কয়েক মুহূর্ত ভ্রুকুটি করে ভাবল। তারপর কুলকার্নিকে জিজ্ঞেস করল চৌকিদার লোকটি কেমন।

কে, মোহনলাল? ভেরি গুড ম্যান। সতেরো বছর চৌকিদারি করছে, কোনও দিন কেউ কমপ্লেন করেনি।

ফেলুদা আরেকটু ভেবে বলল, কোনও জিনিস নেয়নি বলছিস?

আমি বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললাম, আর সেই সঙ্গে এটাও বললাম যে রক্ষিত চৌকিদারের ছেলেকে সন্দেহ করছে।

চলুন, লালমোহনবাবু-আপনি বলছেন লোকটা আপনার খাটে বসে খাট গরম করে দিয়েছিল—আপনার বাক্সে কী আছে একবার দেখে আসি; আমরা চলি, মিস্টার কুলকার্নি। এটা আপাতত আপনার জিন্মাতেই থাক।

তোয়ালেতে মোড়া যক্ষীর মাথাটা ফেলুদা কুলকার্নিকে দিয়ে দিল। তিনি সেটা তাঁর আপিসের সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে চাবি দিয়ে দিলেন। ফেলুদা বলে এল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।

বাংলোয় এসে আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর জিনিস খুব ভাল করে ঘেঁটে দেখল। জামাকাপড় ছাড়া লালমোহনবাবুর সুটকেসে যা ছিল তা হল একটা হামিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, দু খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, তাঁর নোটবুক, আর বেলুচিস্তানের বিষয়ে একটা ইংরেজি বই। নোটবুকটা ফেলুদা এতক্ষণ ধরে উলটে পালটে দেখল কেন সেটা বুঝতে পারলাম না। সব দেখাটেখা হয়ে গেলে বলল, যা আন্দাজ করছি তা যদি ঠিক হয়, তা হলে এসপার ওসপার যা হবার আজই হবে। আর তাই যদি হয়, তা হলে মনে হচ্ছে তোদের একটা জরুরি ভূমিকা নিতে হবে। সব সময় মনে রাখবি যে আমি আছি পেছনে, ভয়ের কিছু নেই। মল্লিকের অ্যারেস্টের কথা কাউকে বলবি না, এখন ঘর থেকে বেরোবি না। এমনিতেও হয়তো বেরোতে পারবি না, কারণ, মনে হয় বৃষ্টি আসছে।

ফেলুদা কথাগুলো বলতে বলতে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, এখন দেখলাম ও নিঃশব্দে হেঁটে জানালার কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল! আমারও চোখ গেল জানালার দিকে। এটা পশ্চিম দিক। এদিকে খানিক দূর ঘাস জমির পরে কতগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছটা আমার চেনা। একজন লোককে গাছপালার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ঘাস পেরিয়ে আমাদের বাংলোর সামনের দিকে চলে আসতে দেখলাম। তার এক মিনিট পরেই লোকটা আমাদের খাবার ঘরে এসে ঢুকল, আর

তার পরেই একটা দরজা চাবি দিয়ে খোলা, আর তারপর সেটাকে ভিতর থেকে বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

ফেলুদা দুবার মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলল-ঠিক আছে, ঠিক আছে।

লোকটা আর কেউ নন-আমাদের প্রতিবেশী মিস্টার রক্ষিত।

আমার কাছ থেকে সময় মতো নির্দেশ পাধি, সেই অনুযায়ী কাজ করবি।

এই শেষ কথাটুকু বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমরা দুজনে ঘরে বসে রইলাম। বাইরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বাধহয় কালো মেঘে। সূর্যটা ঢেকে দিয়েছে বলে আলো কমে এসেছে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, মিস্টার রক্ষিতের চেয়ে বেশি। রহস্যময় লোক আর কেউ নেই, কারণ ওর সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানতে পারিনি।

আর মল্লিক? মল্লিক, সম্বন্ধেও কি সব জেনে ফেলেছি?

জানি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে যে অন্ধকারে ছিলাম, এখনও সেই অন্ধকারেই আছি।

১০. তুমুল বৃষ্টি শুরু হল

বারোটার পর থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল, আর তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। ফেলুদা বলে গেছে আজকেই ক্লাইম্যাক্স, আর তাতে আমাদের হয়তো একটা ভূমিকা নিতে হবে। আমার কাছে সবই অন্ধকার, লালমোহনবাবুর কাছেও তাই। কাজেই ভূমিকাটা যে কী হতে পারে সেটা ভেবে কোনও লাভ নেই। মল্লিক অ্যারেস্টেড, যক্ষীর মাথা সিন্দুকে বন্দি, এর পরেও যে আর কী ঘটনা থাকতে পারে সেটা ভেবে বার করার সাধ্যি আমাদের নেই।

একটার সময় চৌকিদার এসে বলল খান তৈয়ার হ্যাঁয়। ফেলুদাকে ছাড়াই খেতে গেলাম। সে নিশ্চয়ই গেস্ট হাউসের বাবুর্চির রান্না খাচ্ছে। আমরা দুজনে টেবিলে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিস্টার রক্ষিতও এসে পড়লেন। সকালে তাকে গোমড়া মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি বেশ স্বাভাবিক মেজাজ। বললেন, এমন দিনে চাই খিচুড়ি। বাংলাদেশের খিচুড়ি কি আর এরা করতে জানে? সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, ডিমের বড়া, বেগুনি.এ খাওয়ার জুড়ি নেই। এলাহাবাদেও আমি বাংলাদেশের অভ্যাস ছাড়িনি। ভদ্রলোক যে খেতে ভালবাসেন সেটা বেশ বোঝা যায়। লালমোহনবাবুও তাঁর চেহারার অনুপাতে ভালই খান, তবে এখানের চালে কাঁকরটা তাঁর একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। দাঁতে পড়লেই এমন ভাব করছেন যেন মাথায় বাজ পড়ল।

ডালটা শেষ করে যখন মাংসটা পাতে ঢেলেছি তখন একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। আর তারপরেই খ্যানখ্যানে গলায় চৌকিদার বলে একটা হাঁক। চৌকিদার ব্যস্তভাবে একটা ছাতা নিয়ে বাইরে চলে গেল। মিস্টার রক্ষিত হাতের রুটিতে মাংস পুরে মুখে দিয়ে বললেন, এই দুযোগের দিনে আবার টুরিস্ট।

সাদা গোঁফ সাদা ফ্রেঞ্চকটি দাড়িওয়ালা চশমা পরা একজন ভদ্রলোক ক্ষতি খুলতে খুলতে ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছনে চৌকিদার, তার হাতে কুমিরের চামড়ার, একটা আদ্যিকালের সুটকেস। ভদ্রলোক হিন্দিতে বলে দিলেন তিনি লাঞ্চ করে এসেছেন, তার জন্যে আর কোনও হাঙ্গাম করতে হবে না। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বাংলায় বললেন, কাকে নাকি অ্যারেস্ট করেছে শুনলাম?

ফেলুদার বারণ, তাই আমরা বোকার মতো চুপ করে রইলাম। রক্ষিত যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, কাকে? কখন?

সাম ভ্যান্ডাল। গুহার ভেতর থেকে মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিচ্ছিল-ধরা পড়েছে। অ্যাদ্দূর এসে যদি দেখি কেভে ঢুকতে দিচ্ছে না তা হলেই তো চিত্তির। আপনারা এখনও কিছু শোনেননি?

রক্ষিত বললেন, এখনও খবরটা এসে পৌঁছয়নি বাংলোয়।

এনিওয়েয়ে-ধরা যে পড়েছে সেইটেই বড় কথা। এখানকার পুলিশের এলেম আছে বলতে হবে।

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে ঢুকে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি শুনলাম। তিনি আপন মনে বকবক করছেন। ছিটগ্রস্ত।

আড়াইটে নাগাদ বৃষ্টি থামল।

তিনটের কিছু পরে পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখলাম সেই ফ্রেঞ্চকটি দাড়ি দূরের ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরে দেখলাম তিনি ফিরে আসছেন।

প্রায় সাড়ে চারটের সময় যখন চা নিয়ে এল তখন হঠাৎ খেয়াল করলাম যে দরজার সামনে মেঝেতে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ পড়ে আছে। খুলে দেখলাম সেটা ফেলুদার মেসেজ–

পনেরো নম্বর গুহায় যাবি সন্ধ্যা সাতটায়। দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অপেক্ষা করবি।

ফেলুদা নেপথ্যে থেকে ক্যামপেন চালিয়ে যাচ্ছে। এ এক নতুন ব্যাপার বটে।

এ জিনিস এর আগে কখনও হয়নি।

বৃষ্টি আর নামেনি। সাড়ে ছটায় যখন বাংলো থেকে বেরোচ্ছি। তখন ফ্রেঞ্চকাটি আর রক্ষিত দুজনেই যে-যার ঘরে রয়েছে, কারণ দুটো ঘরেই বাতি জ্বলছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বার আষ্টেক বিড়বিড় করে দুর্গ দুর্গ বললেন। আমার নিজের মনের ভগব আমি লিখে বোঝাতে পারব না, তাই চেষ্টাও করব না। হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই পকেটের ভিতর গুঁজে দিলাম।

সাতটা বাজতে দশ মিনিটে আমরা কৈলাসের কাছে পৌঁছলাম। পশ্চিমের আকাশে এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, কারণ জুন মাসে এখানে সাড়ে ছটার পরে সূর্য্যস্ত হয়। যেদিকে পাহাড় আর গুহা সেদিকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, তবে আকাশে মেঘ নেই।

আমরা কৈলাস থেকে ডানদিকে মোড় নিলাম। পরের গুহাটাই পনেরো নম্বর গুহা। দশাবতার গুহা। খাদের উপর থেকে এরই সামনে ফেলুদা নুড়ি পাথর ফেলেছিল।

গুহার সামনে পাহারা নেই। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে একটা প্রকাণ্ড চাতাল, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট মন্দির। আশেপাশে দেখার সময় নেই, তাই আমরা চাতাল পেরিয়ে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গুহার মধ্যে ঢুকলাম।

এটা নীচের তলা। আমাদের যেতে হবে দোতলায়! সঙ্গে টর্চ, আছে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হচ্ছে না। উত্তর-পশ্চিম কোণে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আর কেউ গুহার মধ্যে আছে কি না জানি না, তাই যতটা সম্ভব শব্দ না করে আমরা দোতলায় উঠতে লাগলাম।

দেড়তলায় উঠে একটা খোলা জায়গা। সেখানে দেয়ালের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। আরও খানিকটা উঠে গিয়ে আমরা তিন দিক বন্ধ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে পৌঁছলাম। সারি সারি কারুকার্য করা থাম হলের ছাতটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর আর দক্ষিণের দেয়ালে আশ্চর্য সব পৌরাণিক দৃশ্য খোদাই করা।

ফেলুদার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকটা ক্রমে আলো থেকে দূরে সরে এসেছে, তাই টর্চ জ্বলিতে হল। নিশ্চয় আর কেউ নেই, অন্তত শত্রুপক্ষের কেউ নেই, না হলে ফেলুদা আমাদের আসতে বলত না—এই ভরসাতেই আমরা টর্চ জ্বেলেছি। ওই যে থামের ডানদিকের পিছনে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ঘুপচি কোণ।

আমরা এগিয়ে গেলাম। নীচে সিঁড়ি ওঠার আগেই পা থেকে স্যান্ডাল খুলে নিয়েছিলাম, এখন দেখছি পাথর বেশ ঠাণ্ডা। জায়গায় পৌঁছে আবার স্যান্ডাল পরে নিলাম। তেরোশো বছর আগে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি খোদাই করা পৌরাণিক দৃশ্যে ভরা গুহার ভেতর কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার কোনও ধারণা এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না; একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে পা ধরে যাবে বলে আমরা দুজনেই গুহার কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি জিনিসে চোখ পড়াতে বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল।

আমাদের সামনে হাত পাঁচেক দূরে একটা থামের পাশে আবছা অন্ধকারে একটা আলগা জিনিস পড়ে আছে। একটা লাল রঙের জিনিস। আর তার তলায় চাপা দেওয়া একটা চৌকো সাদা জিনিস।

লালমোহনবাবু ফিস ফিস করে বললেন, একটা কাগজ বলে মনে হচ্ছে। দুজনে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মাথাটা বেশ কয়েকবার ঘুরে গেল, আর সেই সঙ্গে রহস্যটাও আরও ভালভাবে জটি পাকিয়ে গেল।

তলার জিনিসটা কাগজই বটে, আর পেপার ওয়েট-টা হল-ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা!—যেটা আজই সকলে মল্লিকের সুটকেস থেকে বেরিয়ে কুলকার্নির সিন্দুকে লুকিয়ে ছিল।

অন্ধকার বেশ বেড়েছে, তাই কাগজের লেখাটা পড়তে আবার টর্চ জ্বালতে হল।

মাথাটা আপনার কাছে রাখুন। চাইলে দিয়ে দেবেন।

এটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে লিখেছে। লালমোহনবাবু ধরা গলায় জয় মা তারা বলে মাথাটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বগলদাবী করে নিজের জায়গায় নিয়ে এলেন।

আমি কাগজটা পকেটে পুরলাম।

বাইরে ফিকে চাঁদের আলো! থামের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের আকাশ দেখা যাচ্ছে, সে আকাশের রং এখন আশ্চর্যরকম বেগুনি।

ক্রমে সে রং বদলাল। চাঁদ বোধহয় বেশ ভাল ভাবে উঠেছে। গুহার মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকারটা আর নেই।

আটটা -লালমোহনবাবু যেন অনেকক্ষণ চেপে রাখা নিশ্বাস ছেড়ে কথাটা বললেন। একটা অতি ক্ষীণ শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পা ফেলছে। এইবার শব্দ বদলাল। এবার সমতল মেঝেতে হাঁটছে। এবারে দুই থামের ফাঁক। দিয়ে দেখা গেল। লোকটা থেমেছে-এদিক ওদিক দেখছে। একটা খচ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইন্টার জ্বলে উঠল। এক সেকেন্ডের আলো, কিন্তু তাতেই মুখ চেনা হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মল্লিক।

আবার মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এবার যদি মরা মানুষ শুভঙ্কর বোসও এসে হাজির হন। তা হলেও আশ্চর্য হব না।

মল্লিক এগিয়ে এলেন, তবে আমাদের দিকে নয়। তিনি অন্য দিকের কোণে যাচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব দিক। ওদিকে গাঢ় অন্ধকার। ভদ্রলোক সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর আমার মন বলছে-ফেলুদা কোথায়?...ফেলুদা কোথায়?...ফেলুদা কোথায়?... লালমোহনবাবু বাক্স রহস্যের ঘটনার পর বলেছিলেন ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেবেন, কারণ বাস্তব জীবনে বানানো গল্পের চেয়ে অনেক বেশি অবিশ্বাস্য আর রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটে। এই যক্ষীর মাথার ঘটনার পরে উনি কী বলবেন কে জানে!

চাঁদের আলো বেড়েছে। দূরে একটা কুকুর ডাকল। তারপর আরেকটা। তারপর থমথমে চুপ।

তারপর আরেকটা শব্দ।

এবার মেঝে দিয়ে হাঁটছে। এবার দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তাকে। এখনও চেনা যাচ্ছে না। এবার সে লোক এগিয়ে এল। এবার আমাদেরই দিকে। প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। এক পা এক পা করে।

হঠাৎ চোখের সামনে চোখধাঁধানো আলো। লোকটা টর্চ জ্বেলেছে। শুধু টর্চই দেখছি, লোকটাকে দেখছি না। টর্চটা আমাদের উপর ফেলা। সেটা এগিয়ে এল। থামল। তারপর একটা চেনা গলার স্বর-চাপা, কিন্তু কথাগুলো ভীষণ স্পষ্ট–

বামন হয়ে চাঁদে হাত? অ্যাঁ, বাছাধন? আবার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতে শেখা হয়েছে?–দশাবতার গুহায় আটটার সময় আসিবেন, সঙ্গে পাঁচশত টাকা আনিবেন।.তবে আপনার যাহা খেয়া গিয়াছে তাহ পাইবেন, নতুবা.-এ সব কেথেকে শেখা হল, ইতিহাসের অধ্যাপক? কথাগুলো কানে ঢুকছে না, এখনও কালা সেজে বসে আছ? এই ব্যাপারে তুমি জড়ালে কী করে? খাতায় আবার নোট করা রয়েছে দেখলাম।–ফকার ফ্রেন্ডশিপ ক্র্যাশ, ভুবনেশ্বরের যক্ষী, কৈলাসের মন্দির, প্লেনের টাইম...। আবার সঙ্গে একটা নাবালককে রেখেছি কেন? ও কি তোমার বডিগার্ড? আমার ডান হাতে কী আছে দেখতে পাচ্ছ কি?

মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে পিস্তল, এক হাতে টর্চ।

লালমোহনবাবু দুবার আমি আমি বলে থেমে গেলেন। রক্ষিতের চাপা হুমকিতে গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠিল–

আমি আমি ছাড়ো। আসল মাল কোথায়?

এই যো। আপনার জন্যই...

লালমোহনবাবু যক্ষীর মাথাটা রক্ষিতের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক পিস্তলের হাত ঠিক রেখে, টর্চের হাত দিয়ে মাথাটাকে বগলদাবা করে নিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বললেন, এ সব ব্যবসা সকলকে মানায় না, বুঝেছি? যেমন ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, তেমন ছোট বুকে বড় সাধ মানায় না।

মিস্টার রক্ষিতের কথা হঠাৎ থেমে গেল। কারণ, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। গুহার ভিতর। –বাইরের দিক থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী গুহার ভিতর ঢুকে চারদিক ছেয়ে ফেলছে, আর তার ফলে কালো কালো থামগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে আসছে।

সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ একটা গমগমে গলার স্বর শোনা গেল। ফেলুদার গলা; পাথরের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন সে গলা–

মিস্টার রক্ষিত, আপনার দিকে, একটি নয়, এক জোড়া পিস্তল সোজা ত্যাগ করা রয়েছে। আপনি নিজের পিস্তলটা নামিয়ে ফেলুন।

কী ব্যাপার? এ সবের অর্থ কী? মিস্টার রক্ষিত কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

অর্থ খুবই সহজ, ফেলুদা বলল-আপনার অপরাধের শাস্তি দিতে এসেছি আমরা। অপরাধ একটা নয়—অনেকগুলো। প্রথম হল—ভারতের অমূল্য শিল্পসম্পদকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা; দ্বিতীয়, এই শিল্পসম্পদকে অর্থের লোভে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করা; আর তৃতীয়-শুভঙ্কর বোসকে নির্মমভাবে হত্যা করা।

মিথ্যে! মিথ্যে।-রক্ষিত চিৎকার করে উঠলেন। -শুভঙ্কর বোস খাদের উপর থেকে পা হড়কে...

মিথ্যেটা আমি বলছি না, বলছেন। আপনি। যে শাবল দিয়ে আপনি তাকে মেরেছিলেন। সেই শাবল রক্তমাখা অবস্থায় খাদ থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা মনসার ঝোপের ভিতর পাওয়া গেছে। শুভঙ্কর বোস জ্যান্ত অবস্থায় খাদে পড়লে তিনি নিশ্চয় চিৎকার করতেন; অথচ কৈলাসের পাহারাদার কোনও চিৎকার শোনেনি। আর তা ছাড়া আপনার একটা নীল শার্ট আপনি বাংলোর পূর্বদিকে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। সেটা আমিই গিয়ে উদ্ধার করি। এই শার্টের একটা অংশ একটু ছেড়া। মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে শুভঙ্কর বোসের-

মিস্টার রক্ষিত হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই নিমেষের মধ্যে তিনজন জাঁদরেল লোকের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন। ডানদিকে জয়ন্ত মল্লিকের টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম মেক-আপ ছাড়া ফেলুদাকে, মিস্টার ঘোটেকে, আর আরেকটি লোক, যে মিস্টার ঘোটের হুকুমে রক্ষিতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ফেলুদা এবার জয়ন্ত মল্লিকের দিকে ফিরে বলল, মিস্টার মল্লিক, এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ওই যে পিছনের গুহাটা দেখছেন, ওর মধ্যে গিয়ে দেখুন, বাঁদিকের কোনায় মিস্টার রক্ষিতের রেনকোটটা রয়েছে। ওটা নিয়ে আসুন। আয় তপসে–এই ধোঁয়ার মধ্যে আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। আসুন লালমোহনবাবু!

গেস্ট হাউসের ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার খেতে খেতে ফেলুদা আমাদের মনের ধোঁয়া দূর করছে। আমরা তিনজন ছাড়া রয়েছে মিস্টার মল্লিক, কুলকার্নি আর ঘোটে। হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে কথা হচ্ছে, আমি সেটা বাংলাতেই লিখছি। ফেলুদা বলল

প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার রক্ষিতের আসল নাম হল চট্টোরাজ। উনি একটি গ্যাং বা দলের সভ্য, যার ঘাঁটি হল দিল্লি। এই দলের উদ্দেশ্য হল ভারতের ভাল ভাল মন্দির থেকে মূর্তি বা মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করা। এই ধরনের দল হয়তো আরও আছে। আপাতত এই একটি দলকে শায়েস্তা করার রাস্তা আমরা পেয়েছি, কারণ চট্টোরাজকে আমরা এই ঘাঁটির হদিস এবং এর অন্যান্য সভ্যদের নাম বলতে বাধ্য করেছি। ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা চট্টোরাজই চুরি করেন, চট্টোরাজই সেটা কলকাতায় আনেন, চট্টোরাজই সেটা সিলভারস্টাইনের কাছে বিক্রি করেন, আবার প্লেন ক্র্যাশ হবার পর চট্টোরজই সিদিকপুরে গিয়ে পানু নামক ছেলেটির কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে সেটা উদ্ধার করে আনেন, এবং সেই মূর্তি সমেত চট্টোরাজই লুইসনকে ধাওয়া করে এলোরায় আসেন। এখানে আসার কারণ হল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। এক পাখি হল লুইসনের কাছে সেটা বিক্রি করা, আর দ্বিতীয় হল কৈলাস থেকে আরেকটি কোনও টাটকা নতুন মাথা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা জানি এই দুটোর একটা উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। লুইসন মূর্তি কিনতে রাজি হন, কিন্তু সেটা তাঁকে দেবার আগেই চট্টোরাজের হাত ছাড়া হয়ে যায়, ফলে তাকে ল্যুইসনের গালিগালাজ শুনতে হয়। আর মূর্তি চুরির ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয় একবার শুভঙ্কর বোসের অতর্কিত আবির্ভাবে, আর তার কিছু পরেই দশাবতার গুহার সামনে একটি নুড়ি পাথর ফেলার দরুন।

ফেলুদা বোধহয় দম নেবার জন্য চুপ করল। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। আমি না। বলে পারলাম না- আর মিস্টার মল্লিক?

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, মিস্টার মল্লিকের ব্যাপারটা খুবই সহজ। এতই সহজ যে প্রথমে আমিও ধরতে পারিনি। মিস্টার মল্লিক। চট্টোরাজকে ধাওয়া করছিলেন।

কেন?

যে কারণে আমি মিস্টার মল্লিককে ধাওয়া করছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে। অর্থাৎ তিনিও মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন। অবিশ্যি এইখানেই মিলের শেষ নয়। ওঁর আর আমার পেশাও এক। উনিও আমারই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আমি অবাক হয়ে মিস্টার মল্লিকের দিকে চাইলাম। ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি, তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে।

ফেলুদা বলে চলল, আমরা ফোন করে জেনেছি উনি বম্বের ভার্গব এজেন্সি নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। এই কোম্পানির মালিক বাঙালি, নাম ঘোষ। এদেরই একটা তদন্তের ব্যাপারে মল্লিক কিছুদিন হল কলকাতায় আসেন, ওঁর এক বন্ধুর অবর্তমানে কুইনস ম্যানসনে তাঁর ফ্লাটে থাকেন, তাঁর গাড়ি ব্যবহার করেন। এই সব এজেন্সি সাধারণত মামুলি অপরাধের তদন্ত করে থাকে। কিন্তু মিস্টার মল্লিকের তাতে মন ভরছিল না। তিনি চাইছিলেন গোয়েন্দা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে। তাই না, মিস্টার মল্লিক?

মিস্টার মল্লিক বললেন, ঠিক কথা। আর সেই সুযোগটা এসে যায় খুব আশ্চর্যভাবে। তদন্তের ব্যাপারেই গত বিষ্ণুদবার গিয়েছিলাম নগরীমলের দোকানে। সেখানে আমারই সামনে একটি মার্কিন ভদ্রলোক নগরমলকে একটা মূর্তির মাথা দেখালেন। আমার আর্ট সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান আছে, কিন্তু মাথাটা তখন আমার মনে কোনও দাগ কটেনি। শুধু জেনেছিলাম যে সাহেবের নাম সিলভারস্টাইন, আর উনি অত্যন্ত ধনী। পরদিন সকালে কাগজে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খবরটা পড়ি, আর তার আধা ঘণ্টার মধ্যে রেডিয়োতে শুনি যে সিলভারস্টাইন সিদিকপুরের কাছে প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে। তখনই মনে হয় মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে পারলে আমার নাম হতে পারে। সে কথা তক্ষুনি বম্বেতে ফোন করে আমার বসকে জানিয়ে দিই। উনি তাতে রাজি হন। বলেন-কী হয় আমাকে ফোন করে জানিয়া। আমি কাজে লেগে যাই। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। আমি সিদিকপুরে পৌঁছানার পাঁচ মিনিট আগে আরেকটি ভদ্রলোক গিয়ে গ্রামের ছেলেদের কাছ থেকে মূর্তি আদায় করে নেন। ঘটনাটি

ঘটে আমার চোখের সামনে, কিন্তু তখন আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। আমি ঠিক করি ভদ্রলোককে ফলো করব। কিন্তু—

ভদ্রলোকের গাড়ির রংটা মনে আছে?-ফেলুদা মল্লিকের কথার উপর প্রশ্ন করল।

আছে বইকী। নীল রঙের ফিয়ার্ট গাড়ি। সেটাকে ফলে করলাম, কিন্তু সেখানেও ব্যাড় লোক-বারাসতের কাছাকাছি টায়ার পাংচার হয়ে গেল, ভদ্রলোক তখনকার মতো আমার হাতছাড়া হয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমার গোঁ চেপে গেছে। আমি জানি উনি আবার মূর্তিটা বেচবেন। চলে গেলাম গ্র্যান্ড হাটেলে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের দেখা পেলাম, তাকে ধাওয়া করে রেলওয়ে আপিসে গিয়ে তার দেখাদেখি আওরঙ্গাবাদের টিকিট কিনলাম। তার হাতের ব্যাগের ওজন দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তখন পর্যন্ত মূর্তিটা বিক্রি করতে পারেননি। টিকিট কিনে বম্বেতে আমার আপিসে খবরটা জানিয়ে দিলাম।

ফেলুদা বলল, জানি। আপনি বলেছিলেন মেয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। বাপ যে আসলে চট্টোরাজ, আপনি নন, সেটা তখন বুঝতে পারিনি।

মল্লিক বললেন, যাই হোক এখানে এসে প্রথম থেকেই আমি মূর্তিটা হাত করার সুযোগ খুজি। আমি জানতাম যে চোরাই মাল উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে যদি চোরকে ধরে দিতে পারি। তা হলে আরও বেশি নাম হবে; কিন্তু সেটা সাহসে কুলোল না। যাই হাক।–কাল রাত্রে কৈলাসের কাছে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। যখন দেখলাম একে একে বাংলোর সবাই ঘুরতে বেরিয়েছে, তখন বাংলোয় গিয়ে জমাদারের দরজা দিয়ে চট্টোরাজের ঘরে ঢুকে মাথাটা নিয়ে আসি।

ফেলুদা বলল, আপনার পেছনেও যে একজন গোয়েন্দা লেগেছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কি?

মোটেই না; আর সেজন্যেই তো হঠাৎ ধরা পড়ে এত বোকা হয়ে গিয়েছিলাম!

মিস্টার ঘোটে হা হা করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, যখন দেখলাম। আপনি এতখানি পথ লুইসনের সঙ্গে গিয়েও তাকে মূর্তিটা গছাননি, তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম যে আপনি নিদোষ। তার আগে পর্যন্ত, আপনি গোয়েন্দা জেনেও, আপনার উপর থেকে। আমার সবটুকু সন্দেহ যায়নি।

কিন্তু আপনি তো চট্টোরীজকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই না?–প্রশ্ন করলেন মিস্টার মল্লিক।

ফেলুদা বলল, হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে সেটা ছিল শুধু একটা খটকা। যখন দেখলাম একটা পুরনো সুটকেসে নতুন করে নাম লেখা হয়েছে আর এন রক্ষিত, তখনই সন্দেহ হল-~~নামটা ঠিক তো? তারপর কাল

রাত্রে উনি রেনকোট পরে বেরিয়েছিলেন সে কথা লালমোহনবাবুর কাছে শুনি। পনেরো নম্বর গুহাতে একজন লোক ঢুকেছে। সন্দেহ করে ওপর থেকে গুহার সামনে একটা নুড়ি পাথর ফেলি। ফলে অন্ধকারে লোকটা পালায়। ভেতরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পেছন দিকের একটা ছোট গুহায় দেখি রেনকোট, আর তার বিরাট স্পেশাল পকেটে হাতুড়ি, ছেনি। আর নাইলনের দড়ি। আমি ওগুলো সেইখানেই রেখে আসি। বুঝতে পারি চট্টোরাজ হলেন মূর্তিচোর। সেই রাত্রেই দেখলাম চট্টোরাজ তার ঘরে পাগলের মতে কী জানি খুঁজছেন। পরদিন সকালে শুনলাম। আপনি বম্বেতে টেলিফোন করেছেন- মেয়ে ভাল আছে। বুঝলাম মূর্তি এখন আপনার কাছে। অথচ মুশকিল। এই যে, মূর্তিটা হাত ছাড়া হলে আসল চারকে শায়েস্তা করা যাবে না। তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হল।

এ দিকে শুভঙ্কর বোসের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। তার ডেডবডি দেখতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে নীল কাপড়ের টুকরো পাওয়া গেল। আপনি রাত্রে নীল শার্ট পরেছিলেন, কিন্তু এদিকে আমার সন্দেহ চট্টোরাজের উপর পড়েছে! আসলে আমারও আগে চট্টোরাজ পৌঁছেছিলেন ডেডবডির কাছে। উনিই নাড়ি দেখার ভান করে নিজের একটা নীল শার্ট থেকে ছেঁড়া টুকরো শুভঙ্করের হাতে গুঁজে দেন—কারণ শুভঙ্করের মৃত্যুর জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার প্রয়োজন ছিল। উনি নিজের শর্টটি অবিশ্যি পরে বাংলোর পশ্চিম দিকে গাছপালায় ভর্তি একটা নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে রাখেন, আর আমি গিয়ে সেটা উদ্ধার করি।

কিন্তু এত করেও যে সমস্যাটা বাকি রইল, সেটা হল কী করে চট্টোরাজকে ধরা যায়। একটা পথ পেলাম যখন শুনলাম যে কে জানি লালমোহনবাবুর ঘরে ঢুকে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে চট্টোরাজ, কারণ তারই একটি মূল্যবান জিনিস খোওয়া গেছে। লালমোহনবাবুর বাক্সে লালমোহনবাবুর নোটবই ছিল, এবং তাতে যক্ষীর মাথা, প্লেন ক্র্যাশ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এই খাতা চট্টোরাজ না পড়ে পারেন না। এই আন্দাজে আমি লালমোহনবাবুর হাতের লেখা নকল করে চট্টোরাজকে যে চিঠিটা লিখলাম সেটার কথা জানেন। তার আগেই আমি চট্টোরাজকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জানিয়ে দিলাম যে মূর্তি চোর ধরা পড়েছে-

সেই ফ্রেঞ্চকটি দাড়ি?-আমি আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

হ্যাঁ?-ফেলুদা হেসে বলল। -সেটা আমার দু নম্বর ছদ্মবেশী! তোদের কাছাকাছি থাকার দরকার হয়ে, পড়েছিল, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস। যাই হাক-চিঠির টোপ উনি বেমালুম গিলে ফেললেন। এবং তার ফলে যে কী হল সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এবার এইটুকুই বলতে বাকি যে, এই যে গ্যাংটা ধরা হল, এর কৃতিত্বের অংশীদার ভার্গব এজেন্সির মিস্টার মল্লিক যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি পান সেটা

আমি নিশ্চয় দেখব, আর-মিস্টার ঘোটের যাতে পদোন্নতি হয় সেটাও একান্তভাবে কামনা করব। মিস্টার কুলকার্নির ভূমিকাও যে সামান্য নয়। সেটা কলাই বাহুল্য, আর সাহসের জন্য যদি মেডাল দিতে হয় তা হলে সেটা অবশ্যই পাবেন শ্রীমান তপেশ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী।

সকলের হাততালি শেষ হলে জটায়ু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, আমার বোমটা তা হলে আর কোনও কাজে লাগল না বলছেন?

ফেলুদা চোখ গোল গোল করে বলল, সে কী মশাই-এত যে ধোঁয়া হল সেটা এল কোত্থেকে? ওটা তো আর এমনি এমনি বোমা নয়-একেবারে তিনশো ছাপ্পান্ন মেগাটন খাস মিলিটারি স্মোক-বম্ব।